শুধু তারা দু'জন

'না না, মোটেই না। কারণ কিচ্ছু নেই।'

'কিচ্ছু'টার উপর বিশেষ একটা জোর দিল প্রদোষ, তার সঙ্গে হাতের সিগ্রেটটায় টোকা দিল। ছাইটা অ্যাশট্রেয় যতটা না পড়ল, উড়ল তার বেশি। তারপর প্রদোষ উদার গলায় বলল, 'বলেছি তো সি ইজ এ গুড গার্ল—ও, তুমি তো আবার সাহিত্যিক মানুষ, বাংলাতে ভাব প্রকাশ করতে না পারলে চটে যাও—'

আর একবার সিগ্রেটটায় টোকা দিল প্রদোষ, ছাই জমে ওঠেনি তবুও দিল।

প্রদোষ কি তার ভিতরের দ্বিধার ভস্মাবশেষটুকুকে ওইভাবে টোকা দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইছে? এটা তার প্রতীক?

প্রান্তিকের অন্তত তাই মনে হল। সাহিত্যিক প্রান্তিক সোম।

প্রদোষ হয়তো ওর ওই সাহিত্যিক বন্ধুর ভালোবাসাটুকু টোকা দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারছে না, তাই কৈফিয়ত দিচ্ছে, 'বাংলায় তাহলে কী বলব? তিনি একটি আদর্শ মহিলা তো? তাই বলছি। বাস্তবিকই সোম, ধরবার মতো কোনো দোষই নেই নন্দিতার। বরং হিসেব করে দেখলে, বলতেই হবে সর্বগুণসম্পন্না। বিষয় ধরে ধরে নম্বর দিলে প্রত্যেকটি বিষয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। স্ত্রী হিসেবে অতি উত্তম, গৃহিণী হিসেবে অতুলনীয়া, জননী হিসেবে তো কথাই নেই—মা যশোদা হার মানেন, সামাজিক ভূমিকায়—কী বলে তোমাদের বাংলায়? অন—অনবদ্য? কী? ঠিক হল? আর—'

প্রদোষ ওর স্বভাবগত বঙ্কিম হাসিটি হেসে বলে, 'আর যদিও আপাতত পরীক্ষার সুযোগ আসেনি তবু মনে হয়, অবশ্য অন্যের কাছে, প্রেয়সী হিসেবে এখনও যথেষ্ট চার্মিং। কাজেই দোষ-টোষ কিছু দেখাতে পারছি না।'

প্রান্তিক ওর এই বাচালতার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়। বরাবরই প্রদোষ বেশি কথা বলে, কথার কায়দা দিয়েই যেন নিজেকে বিশিষ্ট করতে চায়, কথার ফুলঝুরি কেটেই নিজেকে বিকশিত করে। তবু আজ যেন বেশি বাচালতা করছে। এটা কি দুর্বলতা ঢাকবার ছল? নাকি শুধু খেয়াল? কিন্তু এ কী সর্বনাশা খেয়াল? প্রান্তিক তীক্ষ্ম চোখেই তাকিয়ে বলে, 'দোষ দেখাতে পারছ না, তবু ত্যাগ করতে চাইছ?'

'ত্যাগ?' প্রদোষ শব্দ করে হেসে ওঠে। 'ত্যাগ করতে চাইছি এ-কথা কে বলল? বরং এ-কথা বলতে পার, তিনি আমার সম্পর্কে ভরসা ত্যাগ করুন এইটুকু প্রার্থনা করছি। সাদা বাংলায়, রেহাই চাইছি।'

প্রান্তিক ওদের দু'জনের বন্ধু। প্রদোষের, নন্দিতার। তাই প্রান্তিক ওদের জীবনের এই জটিলতার খবরে ক্ষুব্ধ, ব্যথিত। আর সেই 'বন্ধুর চিত্ত' নিয়েই এসেছে, যদি পরামর্শ আর সহানুভূতির স্পর্শে ওদের দাম্পত্য-জীবনের ভুল-বোঝাবুঝির ফাটলটা মেরামত করে তুলতে পারে।

কিন্তু প্রদোষ বলেছে, 'ভুল-বোঝাবুঝি? নাথিং। পরিষ্কার সূর্যালোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। শুধু একটি মাত্র কথা—আমার আর ওকে ভালো লাগছে না।'

আহত প্রান্তিক বলেছিল, 'শুধু তোমার আর ওকে ভালো লাগছে না? ওর কোনো দোষ নেই তবুও?'

প্রদোষ সেইভাবেই সোফায় হেলান দিয়ে সিগ্রেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে অলস বিলাসের ভঙ্গিতে বলে, 'তাই তো দেখছি। ভদ্রমহিলা তো সেদিকেও আমায় অসুবিধেয় ফেলেছেন। খানিকটা দোষ দেখাতে পারলে হয়তো তোমরা কিঞ্চিৎ শান্ত হতে।'

প্রান্তিক স্থির গম্ভীর গলায় বলে, 'শুধু আমাদের কথাই ভাবছিস প্রদোষ? আর তোর বিবেক? তাকে শান্ত করবি কী দিয়ে?'

'বি-বেক!' প্রদোষ আর একবার হেসে ওঠে। বলে, 'তুমি যে প্রায় 'বাবা মহারাজ'দের সুরে কথা বলছ হে! বিবেক দেখিয়ে আবার আমাকে সেই পুরনো ফ্রেমের খোঁটায় বেঁধে রাখতে চাও? তা বিবেকই যদি দেখাচ্ছ তো বলি, আমার বিবেক এইটাই বলছে, ভালো যখন লাগছে না আর তখন ওই এই ভালো লাগার ভাবনা কেন? সেটাই বরং অসততা।'

প্রান্তিক গাঢ় গম্ভীর গলায় বলে, 'কিন্তু প্রদোষ, তুমি জানো তোমাদের দু'জনের মধ্যেকার ভালোবাসা, তোমাদের সুখী সমৃদ্ধ দাম্পত্য-জীবন, আমাদের সকলের কাছে দৃষ্টান্তের মতো ছিল।'

প্রদোষ আর একটা সিগ্রেট ধরাবার আগে ঠুকতে ঠুকতে বলে, 'তোমার নিজের কথার মধ্যেই কথার উত্তরটা রয়েছে সাহিত্যিক, 'ছিল'। এখন আর নেই।'

'কিন্তু কেন নেই? না-থাকবার একটা যুক্তি থাকবে তো?'

'যুক্তি' প্রদোষ আবার শব্দ করে হেসে ওঠে, 'সব কিছুতেই যুক্তি থাকবে এ তো তোমাদের ভারী আবদার হে! এই যে তোমার মাথাটা দেখতে পাচ্ছি, তুমিও অবশ্যই আর্শিতে দেখতে পাও, ওই মাথায় আগে কি বলে যেন—ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম? তাই না? ছিল কিনা? তোমার চুলের সৌন্দর্য দেখবার মতো ছিল। কিন্তু এখন? এখন আর নেই! এখন মাথা-জোড়া টাকের আভাস। এর যুক্তি কি?'

প্রান্তিক ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'এটা একটা তুলনা হল?'

'হল না কেন? তুমি বলছ একটা জিনিস যখন ছিল, এবং সুন্দর মূর্তিতে ছিল, সেটা চিরকাল থাকবে না কেন? না-থাকলে অন্তত তার যাওয়ার ব্যাপারে যুক্তি চাই। তাই উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি সবকিছুর পিছনেই যুক্তি থাকে না।'

প্রদোষের রং ময়লা, কিন্তু মুখের ছাঁদটি সুন্দর। মা-পিসি বলত—'কুঁদেকাটা মুখ'। বন্ধুরা বলত, গ্রিসিয়ান কাট। এখন ওর দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে পাথর কাটা মুখই বটে। এ মুখের রেখায় রেখায় পাথরের নির্লিপ্ততা। প্রদোষ তার সেই নির্লিপ্ত মুখ নিয়ে বলছে, তার বিবাহিতা স্ত্রীকে তার আর ভালো লাগছে না।—না, কারণ কিছু নেই। শুধু ভালো লাগছে না। তা সেটাকেই যদি কারণ বল, তো কারণ।

প্রান্তিক ব্যথিত গলায় বলে, 'ষোলো বছর ঘর করে, কেন এই অদ্ভুত খেয়ালটা তোমায় পেয়ে বসল প্রদোষ?'

'তা যে-কোনো জিনিসই একঘেয়ে লাগবার জন্যে খানিকটা সময় তো লাগেই।'

প্রান্তিক রুষ্ট মুখে বলে, 'তোমার এই কন্দর্পকান্তিখানি তো বেয়াল্লিশ বছর ধরে দেখে আসছ, একঘেয়ে লাগছে না?'

প্রদোষ যেন ওর এই রোষে আমোদ পায়। তাই প্রদোষের মুখে একটা কৌতুকের আভাস ছড়িয়ে পড়ে।

প্রদোষ বন্ধুর কথার উত্তরে বলে, 'এখনও পর্যন্ত তো লাগেনি। বরং আর্শির সামনে দাঁড়ালে রীতিমতো ভালোই লাগে! একঘেয়ে লাগলে সুইসাইড করে ফেলতে পারি, বলা কিছু যায় না।'

'থামো! বেশি কথার কায়দা দেখাতে এসো না। মিসেস ভৌমিকের দিকটা একবারও ভেবে দেখবে না তুমি?'

'মিসেস ভৌমিক?' প্রদোষ এবার এলায়িত ভঙ্গি করে সোজা হয়ে বসে। সিগ্রেটটা অকারণেই একবার ঝাড়ে। তারপর বলে, 'তোমাদের মিসেস ভৌমিকের কোনো অসুবিধে ঘটাচ্ছি না আমি।'

'কোনো অসুবিধে ঘটাচ্ছ না?'

'না। অন্তত আমি তো মনে করি না ঘটাচ্ছি। তাঁর জন্যে ঘর-বাড়ি, টাকা-কড়ি, পদমর্যাদা, সামাজিক পরিচয় সবই রইল, শুধু প্রার্থনা—অনুগ্রহ করে আমায় ছেড়ে দিন। আমার ওপর যেন না সেই পুরনো প্রেমের ট্যাক্স বসাতে আসেন।'

'পুরনো প্রেম? বলতে লজ্জা করল না প্রদোষ?'

'লজ্জা? কই, করছে না তো! বরং এইটাই ভেবে লজ্জা করছে, যে ভালোবাসা আর নেই, যা কালের বাতাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তিনি সেইটার জন্যে হ্যাংলামি করছেন। অথবা সেইটার অভাবে রাগারাগি করছেন।'

প্রান্তিক ওই নির্মম মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, 'প্রদোষ, তোদের বিয়ের কথাটা তোর মনে পড়ে না?'

প্রদোষ বঙ্কিম হাসি হেসে বলে, 'সেন্টিমেন্টে আঘাত হানছ? কিন্তু বন্ধু হে, আমি তোমার গল্পের নায়ক নই যে, সহসা একটি কথার আঘাতে মুহূর্তে বিরাট পরিবর্তন ঘটে যাবে। আমি হচ্ছি রক্তমাংসে গড়া বাস্তব মানুষ। আমি বুঝি ফাঁকা আইডিয়ার চরণে জীবনকে অর্ঘ্য দেওয়াটা প্রকাণ্ড একটা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। হ্যাঁ, স্বীকার করছি, একদা আমি শ্রীমতী নন্দিতার জন্যে পাগল হয়েছিলাম। তাঁকে পাবার জন্যে বাড়িতে অপ্রিয় হয়েছিলাম, ওদের বাড়িতেও প্রায় অপমানিত হয়েছিলাম, তারপর ওকে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেজিস্ট্রি করে এসে উভয় পক্ষের অভিভাবকের মুখ চুন করে দিয়েছিলাম। এবং তারপরে বেশ কিছুকাল ধরে প্রায় স্বর্গসুখে ভেসেছিলাম, এ সবই আমার মনে আছে। ভুলিনি কিছুই। শুধু সেই স্বর্গ আর এখন স্বর্গ বলে মনে লাগছে না।'

প্রান্তিক উঠে দাঁড়ায়। ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'তা তো লাগবেই না। কারণ তুমি এখন নতুন স্বর্গ আবিষ্কার করেছ! তাই না?'

প্রদোষ আবার হো হো করে হেসে ওঠে, হাসির গলাতেই বলে, 'স্বর্গ কি নরক তা জানি না, তবে আপাতত 'স্বর্গ' 'স্বর্গই লাগছে। কিন্তু প্রান্তিক, সত্যি বল, তার জন্যে আমি নন্দিতাকে কিছু অসুবিধেয় ফেলেছি?'

'অসুবিধেয় ফেলেছ কিনা জিজ্ঞেস করছ?' প্রান্তিক ব্যঙ্গের গলায় বলে, 'তার মানে, তোমার ধারণায় ফেলনি অসুবিধেয়?'

'অফকোর্স? আর সে ধারণাটা আমার ভুল নয়। নন্দিতাকে আমি বলতে গেলে সর্বস্ব দিয়ে রেখেছি। ব্যাঙ্কে আমাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট, অতএব যখন ইচ্ছে, যখন দরকার, টাকা তুলে নিতে পারছে, ভাড়া দেওয়া বাড়িটা ওর একাকার নামে, কাজেই ভাড়াটের ছশো টাকা ওর নিজস্ব, সারা সংসারের চাবি ওর হাতে, ছেলেটা মানুষ হচ্ছে ওরই ইচ্ছানুযায়ী, কোথাও কোনোখানে আমার ইচ্ছের অঙ্কুশ আঘাত করছে না তাকে। আর কি করতে পারি বল? ওর থেকে আর বেশি কিছু করার নেই আমার।'

প্রান্তিক গাঢ় গলায় বলে, 'কিন্তু আগে এ-সবের ওপরে এর থেকে বেশি, অনেক বেশি কিছু করবার ছিল তোমার প্রদোষ! করেওছ। এই বস্তুপুঞ্জটাকেই 'সর্বস্ব' বলে মনে করনি। আরও কিছু দিয়েছ।'

প্রদোষ উদাস গলায় বলে, 'তখন যা দেবার ছিল এখন তা নেই। এছাড়া আর কোনো বক্তব্য নেই আমার।'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার একই কথা বলে প্রদোষ। নন্দিতাকে সে কিছুমাত্র অযত্ন করছে না, বরং

যতদূর সম্ভব সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখতে চেষ্টা করছে। নন্দিতাকে পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে, নন্দিতার গতিবিধি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করছে না, ইত্যাদি।

প্রান্তিক তবু চেষ্টা করছে। সে যেন ওদের লঘু একটু দাম্পত্য কলহ মিটিয়ে দিতে এসেছে, তাই সে বলে, 'অথচ আগে? মনে আছে তোমাদের, প্রদোষ? মিসেস ভৌমিক যদি একদিনের জন্যে বাপের বাড়ি যেতেন, তুমি ছটফট করতে, রাগারাগি করতে রাতদুপুরে সেখানে গিয়ে হাজির হতে, নিয়ে চলে আসতে। ব্যাপারটা প্রত্যেকবারই এমন মহাভারত হয়ে উঠত যে, সে-সব এখন ভুলে গেছি বললে অবিশ্বাস্য হবে।'

প্রদোষ উঠে দাঁড়ায়, ঢিলে পায়জামার ঢিলে পকেটে হাত দিয়ে পায়চারি করতে করতে বলে, 'একদা আমি হামা দিতাম, সোম! আর একদা সিগারেট খেতে গেলেই কাশতাম। বুঝলে? আশ্চর্য, তুমি একটা নভেল-লিখিয়ে ব্যক্তি অথচ কিছুতেই কেন বোঝাতে পারছি না তোমাকে—যা ফুরিয়ে গেছে, তা দেব কোথা থেকে? তবে এর জন্যে নিজেকে আমি খুব একটা পাষণ্ড ভাবতে পারছি না—'

'ভাবতে পারছ না?'

প্রান্তিক উত্তেজিত গলায় বলে, 'তুমি একটা বিবাহিত ব্যক্তি, একটা তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলের বাপ তুমি, হঠাৎ তোমার ভালোবেসে-বিয়ে-করা, আর এতদিনের-ঘর-করা স্ত্রীকে বলছ 'আমরা ওপর দাবি ত্যাগ কর' কারণ আমি এখন পরকীয়া প্রেমে মেতেছি। তবু তুমি নিজেকে পাষণ্ড ভাবতে পারছ না?'

'না, পারছি না। কারণ আমি মনে করি না মানুষ একটা ইঁট-কাঠের ঘর, যার পরিবর্তন নেই। তাছাড়া আমি তো স্বীকার করছি ভাই, ফ্রাঙ্কলি স্বীকার করছি, নন্দিতার মধ্যে আমি আর কোনো আকর্ষণ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি মহৎ চরিত্র মহাত্মা নই, নেহাতই ক্ষুধা-তৃষ্ণার অধীন রক্ত-মাংসের মানুষ মাত্র, কাজেই—'

প্রান্তিক বোধকরি আজ ওদের সম্বন্ধে একটা হেস্ত-নেস্তই করতে এসেছে, তাই অন্যদিনের মতো তর্কের মাঝখানে রেগে উঠে যায় না। যদিও অন্যদিন তর্ক এতদূর গড়ায় না। প্রান্তিক তাই তীব্র গলায় বলে—'মানুষ বলতে তুমি কী বোঝ, প্রদোষ?'

প্রদোষ হাসির গলায় বলে, 'দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুইখানি হাত, দুইখানি পা ও একটি ধড়বিশিষ্ট একটি জীব। আবার কি?'

'শুধু জীব! ওঃ'—প্রান্তিক যেন ঘৃণায় চুপ করে যায়।

প্রদোষ এ ঘৃণায় বিচলিত হয় না।—প্রদোষ হেসে হেসে বলে, 'তবে? আমি তো তোমাদের মতো সাহিত্যিক নই, আর নিজেকে সনাতন ভারতের মহান ঐতিহ্যের ধারক বাহক বলেও দাবি করি না। অতএব কেন খামোকা জীবকে শিব ভাবতে বসব? কিন্তু আলোচনাটা বড়ো বেশি ভারী হয়ে যাচ্ছে সোম, একটু কফি খাওয়া যাক।'

'কফি!'—প্রান্তিক ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'তোমার চাকরের হাতের কফি খেতে বাসনা নেই আমার প্রদোষ, কফি থাক।'

প্রদোষ হেসে ওঠে, 'তা গৃহিণী যখন অনুপস্থিত তখন চাকরই তো ভরসা। তিনি তো প্রায় সপ্তাহখানেক তাঁর কোন্ এক বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে বসে আছেন।'

প্রান্তিক একটু চমকায়। প্রান্তিক বলে, 'বান্ধবীর বাড়িতে? কেন, ওঁর বাপের বাড়িতে নয়?'

'না,' প্রদোষ অবহেলাভরে আর একটা সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে বলে, 'বাপের বাড়ি যাননি। বাপ-মায়ের অবাধ্য হওয়া লাভ-ম্যারেজের এই পরিণাম তাঁদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করতে নাকি ওঁর লজ্জায় মাথা কাটা যাবে।'

'যাওয়াই তো উচিত।' প্রান্তিক রুক্ষ গলায় বলে, 'তোমার মতোন লাজলজ্জাহীন বেহেড কে হতে পারে?'

'আর এতে মোটেই উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে না, কেমন? প্রদোষ ব্যঙ্গতিক্ত মুখে বলে, 'কেউ কিচ্ছু টের পাচ্ছে না, তাই না? লজ্জা যদি তাঁর ভিতরে থাকত, এভাবে চলে যেতে পারতেন না।'

প্রান্তিক এই তিক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'অভিমান আবেগ রাগ দুঃখ এসব কিচ্ছু থাকবে না মানুষের?'

'থাকবে। থাকুক।' প্রদোষের মুখে একটুকরো ধারাল হাসি ঝলসে ওঠে, 'অতএব লোভ মোহ বাসনা কামনা এগুলোও থাকবে। এর সবগুলোই তোমাদের ওই প্রকৃতির গড়া বৃত্তি।'

প্রান্তিক হতাশ গলায় বলে, 'তবে যাও, লোভকে জয়যুক্ত করতে ব্যাঙ্ক লুঠ করোগে। বৃত্তিগুলো আছে বলেই প্রবৃত্তির দাস হব, এটা একটা শিক্ষিত মানুষের কথা নয়, প্রদোষ! বহু যুগ ধরে মানুষ সংযমের অনুশীলন করে করে একটা সভ্যসমাজ গড়ে তুলেছে, যে সমাজের আইন আছে, শৃঙ্খলা আছে, মানবিকতা বোধের সাধনা আছে, সেই বহুদিন-সঞ্চিত সম্পদকে কোনো মূল্য দেবে না তুমি? নিজেকে চেক্ করতে চেষ্টা করবে না?'

'ওরে বাপস্!' প্রদোষ আবার শব্দ করে হেসে ওঠে, অনেকক্ষণ ধরে হাসে! তারপর বলে, 'সত্যিই তোমার উপদেশগুলো প্রায় বাবা মহারাজদের কান-ঘেঁষা হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে চেক্! হাসালে সোম। কেন সে চেষ্টাটি করব বলতে পার? যাতে আমার সুখ, যাতে আমরা আহ্লাদ, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যাতে যন্ত্রণা, যাতে জ্বালা, সেটা বেছে নিতে যাব? মাপ করো ভাই, তোমাদের হিসেবমতো মানুষ হবার ক্ষমতা যদিও বা থাকতে পারে, বাসনা আমার নেই।'

প্রান্তিক এবার উঠে দাঁড়ায়। প্রান্তিকের আর সহ্য হয় না। বলে, 'তার মানে তুমি সত্যিকার শয়তান! যদি নিজেকে সামলাবার আত্মপ্রকাশ করতে, হয়তো সামান্যতম সহানুভূতিও আসত তোমার উপর। কিন্তু তুমি জোর গলায় ঘোষণা করছ—সে ইচ্ছেই তোমার নেই। ছি ছি!'

এ ছি ছি-কারে প্রদোষের মুখের একটি রেখাও এদিক-ওদিক হয় না। প্রদোষ তেমনি পাথুরে মুখেই বলে, 'করলাম ঘোষণা। কারণ আমি অনেস্ট্।'

হ্যাঁ, শুধু এইটুকুই বলে প্রদোষ। অন্যদিনের মতো বলল না, 'কি হে, চটে-মটে যে চলেই যাচ্ছ। বন্ধুর থেকে বন্ধুপত্নীর প্রতি দরদটাই যে দেখছি প্রবল!'

বলত। অন্যদিন হলে বলত। আজকাল এই ধরনের কথাই বলছিল। বলতে পারত, 'মিসেস ভৌমিকের প্রতি তুমি যে-রকম সহানুভূতিশীল, তাতে আমার অনেকটা নিশ্চিন্ততা আসছে। হৃদয়রসস্পর্শের অভাবে গোলাপ গাছটি শুকিয়ে যাবে না। যে-কোনোখান থেকে একটু হৃদয়রসের স্পর্শ পেলেই কাজ চলে যায় মানুষের। ওটাই মানুষের ধর্ম। দেখতে পাও না কত ব্যক্তি নিজে বিয়ে-থা ঘর-সংসার করে না, অন্যের দাম্পত্য জীবনের মধ্যে নিজেকে পরগাছার মতো জড়িয়ে রেখে দেয়! ওই থেকেই সুখ আহরণ করে। ওই থেকেই হৃদয়রস পায়। সে সংসারটি কোনো একটি তুতো বৌদির বা তুতো দিদির অথবা কোনো ভাইঝির কি ভাগ্নীর, ভাইপোর কি ভাগ্নের, বা নিঃসর্ম্পকের হতে পারে। সব রকম পরিস্থিতিই ঘটে মানুষের। তা সে এইরকমই কোনো জীবনের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিয়েই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায় তারা। অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষই যে একটা নিয়মের ছাঁচে ঢালাই হবে, তার কোনো মানে নেই। অতএব তুমিও তা না পারতে পার। আর—'

ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে এটুকুও বলতে পারত প্রদোষ, 'আর বলেইছি তো, এ বাড়ির মহিলাটি এখনও প্রেয়সী হিসেবে চার্মিং।' কিন্তু এসব বলল না প্রদোষ।

তার মানে, আর এসব কথা ভালো লাগছে না ওর। তাই শুধু বলল, সত্যি কথাটা আমি স্পষ্ট করেই বলি, সোম। কারণ আমি অনেস্ট্।

প্রান্তিক ওই সত্যভাষণের গর্বে গর্বিত মুখটার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রদোষ কেমন একরকম কৌতুকের দৃষ্টিতে ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরই অসহিষ্ণুভাবে উঠে দাঁড়ায়। এভাবে বোকার মতো এতক্ষণ তর্ক করার কোনো মানেই হল না। সোজাসুজি বলে দিলেই হত, আমি শিশু নই প্রান্তিক যে, তুমি সদুপদেশ দিয়ে আমায় বিপথ থেকে সুপথে আনবে।

হ্যাঁ, অত কথা না-বলে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হত। উপদেশ দেওয়ার মুরুব্বিয়ানা ঘুচে যেত সাহিত্যিকের। মুরুব্বিয়ানা করবার সুযোগ অনেকেই পেয়েছেন। এই তো সেদিন নন্দিতার বড়োদিদি এসে অনেক সাধুবাক্য বলে গেলেন। যেন দুটো বাচ্চা ছেলে-মেয়ে খেলা করতে করতে ঝগড়া করেছে, তিনি মিষ্টি তিরস্কার আর হিত উপদেশ দিয়ে মিটিয়ে দেবেন! রাবিশ্!

প্রদোষের পাজামার পা দুটো লটপটাচ্ছে, প্রদোষের গেঞ্জির স্ট্র্যাপটা কাঁধে ঝুলে পড়েছে, প্রদোষকে এখন খুব ঢিলে-ঢালা দেখাচ্ছে। তবু প্রদোষ সেই ঢিলে-ঢালা হয়েই ঘরের মধ্যে জোরে জোরে পায়চারি করতে থাকে। আর নন্দিতার উপর একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশ অনুভব করে।—

এইটি করেছে নন্দিতা। এই অন্যকে মুরুব্বিয়ানার সুযোগ দেওয়া।

আত্মসম্মান! আত্মসম্মানের বড়াই নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন! কি? না, ভালোবাসাহীন স্বামীর ঘরে থাকবেন না আর! আত্মসম্মানের হানি তাতে। রাবিশ্!

আত্মসম্মানের বানানটাও জানে না। জানলে নিজের এই ব্যাঙ্ক-ফেলের খবরটা ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াত না।

তুমি মহিয়সী মহিলা, নিজের কেন্দ্রে স্থির ছিলে বাবা, নিজের পদমর্যাদায় অটল। ইচ্ছে করলেই এই দৈন্যের খবরটা ছেপে ফেলতে পারতে তুমি। সংসারের সর্বেসর্বা কর্ত্রী হয়ে, ভৃত্যবর্গের উপর দুর্ধর্ষ মণিবাণী হয়ে, সন্তানের মাতৃরূপে মহিমময়ী হয়ে, এবং একটা তরলমতি স্বামীর সম্পর্কে অগ্রাহ্যবতী হয়ে বেশ কাটিয়ে দিতে পারতে তুমি।

অথবা তোমার অনুগতজনদের প্রশ্রয় দিয়ে বড়িতে ডেকে আড্ডা বসাতে পারতে রোজ, নিজে হাতে কফি বানিয়ে খাইয়ে ধন্য করতে পারতে তাদের, আবার তরুণীর ভূমিকায় 'লাভলি' হয়ে উঠতে পারতে। বয়েসটা পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হলেও রূপলাবণ্যে আজও তুমি তেইশ-চব্বিশকে হারাতে পার। অতএব আমার এখন তোমাকে বোরিং লাগলেও, এখনও দু-চারটেকে ঘায়েল করবার ক্ষমতা তুমি রাখো।

হঠাৎ শব্দ করে উচ্চারণ করে প্রদোষ—আর তাতে আমি ঈর্ষান্বিতও হতাম না। বরং মুক্তিই পেতাম। তুমি তাহলে তখন যে বস্তু আমার আর নেই, ফুরিয়ে গেছে, সেটাকে পাবার জন্যে আমার ওপর জুলুম করতে আসতে না।

তারপর বসে পড়ে প্রদোষ। বিড়বিড় করে বলে, কিন্তু তুমি দুটোর একটাও করলে না। তুমি ঘর ছেড়ে চলে গিয়ে বান্ধবীর বাড়িতে বসে থাকলে। তার মানে, নিজের দৈন্যের ঘরটা খুলে খুলে দেখালে সবাইকে। চাকর-বাকরের কাছে হাস্যাস্পদ হলে, বন্ধুজনের কাছে হাস্যাস্পদ হলে। ছেলের কাছে ছোটো হয়ে গেলে।

এরপর আবার যেদিন তুমি এই চৌকাঠের মধ্যে এসে ঢুকবে, তখন কি সেই তোমার পুরনো পোস্টটা ফিরে পাবে?—পাবে না। তার কারণ ওই অবজ্ঞার দৃষ্টিগুলো সঞ্চয় করেছ তুমি। আর সেটা করেছ সম্পূর্ণ হঠকারিতা করে।

আমি তো বাপু তোমার অন্য কোনো অধিকারে হস্তক্ষেপ করিনি! তবে? তবে কেন তুমি এমন করে নিজের ক্ষতি করলে? ভেবেছিলে তোমার হতভাগ্য স্বামীটাকে লোকের কাছে হেয় করবে। হেয়টা যে তুমি নিজেই হয়েছ, হবে—তা ভেবে দেখছ না?

তোমার ওই বান্ধবী? যে তোমায় বড়ো সহানুভূতিতে আশ্রয় দিয়েছে? তোমার সেই মিস বান্ধবীটি হয়তো এখন মুখে তোমায় খুব সমর্থন করবে, কিন্তু আমি নিশ্চিত বলব, কক্‌খনো, সে সত্যিকার সমর্থন করবে না তোমায়। মনে মনে তোমায় আত্মসম্মানহীন বোকাই বলবে।

জানি না, মেয়েদের কথা মেয়েরাই জানে, তবে আমার কথা যদি বলি, বলব এ রকম ক্ষেত্রে আমি তোমার মতো বোকামি করতাম না হে নন্দিতাদেবী! আমি আমার স্ত্রীর ভালোবাসা হারানোর খবর বা স্ত্রীর অন্যের প্রতি আসক্তির খবর ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াতাম না। সমাজের পোজিশনটা রাখতাম। যেমন রেখেছে চারুতোষ।...তার স্ত্রীকে আর স্ত্রীর প্রণয়ীকে সান্ধ্যবিহারের সুযোগ দিতে রোজ বলছে, 'মাথাটা কেমন ধরেছে, আমি আজ আর বেরব না।'।

অথবা কোনো কোনোদিন বাড়িতে বসে আড্ডা দেবার সুযোগ দিতে বলেছে, 'তোমরা বসো, আমি একটু ঘুরে আসি'।

এটুকু বলে কেটে পড়েছে, রাত দশটার আগে ফেরেনি! তারপর হাস্যবদনে এসে বলেছে, 'ইস্, এত দেরি করে ফেললাম!'

তার মানে, চাকর-বাকরদের সামনে সিন্ ক্রিয়েট করে মান খাটো করেনি। স্ত্রীর কাছেও এ খবরটা জানিয়ে খাটো হয়নি যে, তোমাকে হারিয়ে আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি গো, আর কিছুই নেই আমার।

বুদ্ধিমান লোক চারুতোষ।

চারুতোষের বুদ্ধির কথা ভাবতে গিয়েই হঠাৎ চারুতোষের বৌয়ের সেই সাপের মতো মসৃণ আর সাপের মতো চকচকে দু'খানি হাতের কথা মনে পড়ে যায় প্রদোষের। দু'ইঞ্চি চওড়া কাঁধের ব্লাউজের গহ্বর থেকে নেমে এসেছে যে দু'খানি হাত, কথা বলবার সময় লীলায়িত ভঙ্গিতে আন্দোলিত হবার জন্যে।

প্রদোষের হয়তো এখন আর মনে পড়ে না, কিন্তু প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিল ওই হাতের সৌন্দর্যেই। নইলে চারুতোষের বৌ বিপাশা তো রূপে-রঙে নন্দিতার ধারে-কাছেও লাগে না। কিন্তু রূপ তো শুধু রঙে নয়, গড়নে নয়, অদৃশ্য কোনো লোকে তার বাস। আর সে শুধু এক-একজনের চোখে এক-একরকম হয়ে ধরা দেয়। ময়লা-রং বিপাশার ওই একেবারে নিরাভরণ সাপের মতো চকচকে হাত দুটো তো চারুতোষের চোখে কুদৃশ্য। অথচ প্রদোষ যেন ওই হাতের ভঙ্গিমায় আর আন্দোলনের ছন্দে পতঙ্গবৎ এগিয়ে গিয়েছিল।

চারুতোষ ওদের পুরনো বন্ধুদের দলের নয়, চারুতোষের সঙ্গে আলাপ ক্লাবের সূত্রে। সস্ত্রীক গিয়েছিল সেদিন সবাই ক্লাবে, কোন্ একটা বিশেষ উৎসবে। নন্দিতা বাড়ি ফিরে বলেছিল, 'উঃ তোমাদের ওই পালিত সাহেবের বৌটা কী বাচাল বাবাঃ! অতগুলো মেয়ে-পুরুষের মধ্যে যেন উছলে বেড়াচ্ছে। তাও যদি রূপ থাকত!'

প্রদোষ সেদিন অভ্যাসমতো কথা মেনে নেয়নি। প্রদোষ সূক্ষ্ম হাসি হেসে বলেছিল, 'রূপ থাকলে নেচে বেড়ানোর রাইট থাকে?'

'সে-কথা হচ্ছে না', নন্দিতা বলেছিল, 'কুচ্ছিৎরা নেচে বেড়ালে আরও বেশি খারাপ লাগে, তাই বলছি। ওই কালো সিড়িঙ্গে চেহারা, হাত দুটো আবার তেমনি লম্বা, সেই হাত দুখানা স্রেফ খালি করে—'

'স্রেফ খালি কেন? ঘড়ি ছিল তো?'

'ঘড়ি তো এক হাতে, অন্য হাতটা?' তখনও নন্দিতা নিঃসন্দিগ্ধ ছিল, তাই নন্দিতা বলতে পেরেছিল, 'যত কথা, তত হাত নাড়া! বাবাঃ!'

সেদিন প্রদোষ শেষ অবধি মৃদু হেসে বলেছিল, 'তোমরা মেয়েরা একজন আর একজনকে সহ্য করতে পার না।'

আর নন্দিতা মৃদু হেসে বলেছিল, 'আর তোমরা পুরুষরাও বাচাল মেয়েমানুষ দেখলেই আর ধৈর্য ধরতে পার না। অগ্নিতে পতঙ্গবৎ ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাও।' বলেছিল একথা নন্দিতা। নিতান্তই ব্যঙ্গ-কৌতুকে।

স্বপ্নেও ভাবেনি, বিধাতা অলক্ষ্যে হাসলেন। কি করে ভাববে?

বিপাশাকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভাববার কথা যে নন্দিতার কল্পনার বাইরে।

যা কল্পনার বাইরে, তা সন্দেহের মধ্যে আসবে কি করে? নন্দিতাকে যদি সেদিন নন্দিতার বিধাতা সতর্ক করেই দিতে আসতেন, নন্দিতা কি সেই পরামর্শ নিত সভয়ে?

নন্দিতা কি হেসে উড়িয়ে দিত না সেই সতর্কবাণী? তাই দিত। নন্দিতার বুক বাঁধা ছিল। তখনও ছিল। নন্দিতা ভাবতে পারেনি ওই সর্পবাহুযুগল নন্দিতার জীবনের মধুচক্রের দিকে প্রসারিত হবে। সাপের মতো ছোবল হেনে তুলে নেবে নন্দিতার জীবনের সুখগুলি, শান্তিগুলি, ছোটো ছোটো ইচ্ছার ফুলের তোড়াটি।

হ্যাঁ, ছোটো ছোটো ইচ্ছে নিয়েই জীবন ছিল নন্দিতার তখন। নন্দিতা তখন ভাবছিল ছেলেটার স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে দার্জিলিং বেড়াতে যাবে। দু'বার যাওয়া হয়েছে? তাতে কি? ভালো জায়গায় শতবার যাওয়া যায়।

নন্দিতার এ-যুক্তি খণ্ডন করে দিয়েছিল প্রদোষ, বলেছিল, 'আমার বোরিং লাগে।'

'বাঃ, টুবলু কি ভালো করে দেখেছে? একবার যখন যাওয়া হয়েছিল, ও তো জন্মায়নি, আর একবার নেহাত বাচ্চা মাত্র, মনেই নেই কিছু। টুবলুই দার্জিলিং-দার্জিলিং করছিল—'

প্রদোষ সেদিন আদর্শ পিতার চাইতে খারাপ কিছু ব্যবহার করেনি। প্রদোষ হেসে বলেছিল, 'তবে তাই! তোমার টুবলু যখন ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন! এর ওপর আর কথা কি?'

নন্দিতা কালো দু'চোখে আলোর ঝিলিক হেনে বলেছিল, 'আহা, আমি বুঝি ছেলের সব ইচ্ছেকেই প্রশ্রয় দিই?'

'দাও কি না-দাও তুমিই জানো।' প্রদোষ বলেছিল, 'তোমাদের মাতা-পুত্রের ব্যাপার তুমিই জানো।'

'আহা রে! আমাদের মাতা-পুত্রের ব্যাপারে তোমার কোনো ভূমিকা নেই, কেমন?' নন্দিতা ঝলসায়, ঝঙ্কার দেয়, নন্দিতার মস্তবড়ো খোঁপাটা ঘাড়ে ভেঙে পড়ে, আর সেই মুহূর্তে রোজ ওই দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত প্রদোষের হঠাৎ মনে হয়, একগাদা চুল কী বিশ্রী! মেয়েদের গ্রীবার যে একটা বিশেষ সৌন্দর্য আছে, এটা আমাদের মেয়েরা জানেই না। তারপর মনে হয়েছিল, কেউ কেউ জানে অবশ্য। তাই চুলগুলো ছেঁটে খাটো করে নেয়।

প্রদোষ সেই দৈবাৎ-দেখা এক-আধটা গ্রীবার সৌন্দর্যের কথা ভাবতে ভাবতে বলেছিল, 'আমার ভূমিকা? কই, খুঁজে তো পাচ্ছি না! এইটুকু শুধু জানি, তোমরা যেখানে যেতে ইচ্ছুক হবে, অমোঘ আইনের বলে আমাকেও সেখানেই যেতে হবে। কারণ ভোটে তোমাদের জয়ই অনিবার্য।'

তখনও সেই কথা বলেছিল প্রদোষ। হয়তো তখনও প্রদোষের সেই বিশ্বাসই ছিল।

কিন্তু—হঠাৎ যাত্রার ক'দিন আগে যখন প্লেনের টিকিট 'সংগ্রহ' হয়ে গেছে, তখন প্রদোষ বলে বসল, 'এই নন্দিতা, এক কাজ করো, তোমার ছোড়দাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাও।'

'ছোড়দাকে? আমাদের সঙ্গে?' নন্দিতা বেশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'তার মানে?'

'মানে অতি প্রাঞ্জল, আমি আর ওই তোমার দার্জিলিংয়ে যাচ্ছি না, যাচ্ছি রানিক্ষেত। আমার টিকিটটা তো রয়েইছে, তাছাড়া তোমাদেরও একটা গার্জেন হবে, তাই বলছি ছোড়দাকে—।' অভ্যাসের অতিরিক্ত দ্রুত কথা বলেছিল সেদিন প্রদোষ।

কিন্তু নন্দিতা? নন্দিতা অভ্যাস-বহির্ভূত থেমে থেমে কথা বলেছিল, 'কিন্তু হঠাৎ তোমারই বা রানিক্ষেতে যাবার দরকার কি হল, আর আমাদেরই বা অভিভাবক বদলের প্রয়োজন হচ্ছে কেন?'

'বাঃ, আমি তো গোড়া থেকেই বলছি দার্জিলিংয়ে যাবার আমার কোনো আকর্ষণ নেই।'

নন্দিতা তখনও নিশ্চিন্ত, তাই নন্দিতা স্বামীর গায়ের ওপর এলিয়ে পড়ে বলেছিল, 'তা অন্য আকর্ষণ তো আছে? না কি নেই?'

প্রদোষের হঠাৎ মনে হয়েছিল, নন্দিতা কি ভারী! মনে হয়েছিল, নন্দিতার গায়ে বড়ো বেশি মাংস। তবু প্রদোষ তার মুখের ওপর বলেনি সে কথা। কারণ তখনও প্রদোষ অনেস্ট হয়নি। তাই প্রদোষ রহস্যের হাসি হেসে বলেছিল, 'সে আকর্ষণকে তীব্র করতে, মাঝে মাঝে বিরহ ভালো।'

'আর বেশি তীব্র দরকার নেই', নন্দিতা বলেছিল, 'যা করছিলে, করো। যেমন যাওয়া হচ্ছিল হোক। রানিক্ষেত যাব! অতয় কাজ কি? যখন যাব, সবাই যাব।'

বলেছিল। কিন্তু হয়নি।

প্রদোষ তার নবলব্ধ বন্ধু চারুতোষ পালিতের পরিবারের সঙ্গে রানিক্ষেত চলে গিয়েছিল।

নন্দিতাকেও অতএব ছোড়দাকে সঙ্গে নিতে হয়েছিল। এবং প্রদোষের সঙ্গে যথেষ্ট কথা-কাটাকাটি আর মান-অভিমানের পালা চললেও অন্যত্র বলেছিল, 'অফিসের বন্ধুদের সঙ্গে যাচ্ছেন আর জানোই তো পুরুষের একদিকে সমগ্র পৃথিবী আর একদিকে অফিস। তা পাল্লাটা ঝুঁকি হয় ওই শেষটাতেই।'

এই বলে মান বাঁচিয়েছিল নন্দিতা সেদিন।

অথচ প্রদোষ এখন নন্দিতাকে ঘৃণা করছে। প্রদোষ ভাবছে, নির্বোধ নন্দিতা তার ব্যাঙ্ক-ফেলের খবরটা ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু একদিনে কি বলে বেড়িয়েছিল নন্দিতা? একদিনেই কি উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল?

যখন প্রদোষ রানিক্ষেত থেকে ফিরে এসেছিল, আর বোঝা গিয়েছিল প্রদোষ তার আত্মাকে বিক্রি করে এসেছে, তখন কি বহু ছলনার মলাট দিয়ে দিয়ে নিজের জীবনের এই ব্যাঙ্ক-ফেলের কাহিনি ঢাকেনি নন্দিতা? ক্রমশ নন্দিতা ধৈর্য হারিয়েছে, প্রতিক্রিয়ায় প্রখর হয়েছে।

কিন্তু তার আগে? নন্দিতা তার স্বামীর বিকিয়ে-যাওয়া আত্মাকে ফিরে কিনে নেবার জন্যে অনেক মূল্য ধার্য করেছে, অনেক দর দিয়েছে, কিন্তু সফল হয়নি। নন্দিতা যত চেষ্টা করেছে, যত মান-অভিমান করেছে, প্রদোষের ততই নন্দিতাকে 'বোরিং' লাগতে শুরু করেছে, সাংসারকে বিরক্তিকর মনে হয়েছে, তার সন্তানকে অবান্তর লেগেছে।

প্রদোষের যে একটা তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে আছে, এটা প্রকাশ করতে যেন এখন লজ্জাবোধ করে প্রদোষ। আর ওই ছেলেটার জন্যে নন্দিতাকে দায়ী করে। বিয়ের দু-বছরের মধ্যেই বাচ্চা-কাচ্চা আসুক এটা পছন্দ ছিল না প্রদোষের, কিন্তু 'চির যশোদা' নন্দিতা তুমুল ঝড় তুলে প্রদোষের এ মতবাদকে খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছিল।

কিন্তু বিধাতা বাদী। নন্দিতার পক্ষে বাদী। ওই একটি সন্তানের সঙ্গে সঙ্গেই নন্দিতার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেছে। বড়ো একটা অপারেশনের শেষে জবাব দিয়েছে ডাক্তার। তাই টুবলু নন্দিতার প্রাণ মন ইষ্ট।

কিন্তু প্রদোষেরও তো তাই হওয়া উচিত ছিল? হিসেবমতো তাই ছিল বৈকি। কিন্তু প্রদোষের মতে মানুষ ছাঁচের পুতুল নয়, মানুষ অঙ্কশাস্ত্রের সংখ্যা নয়, মানুষ হচ্ছে জলজ্যান্ত প্রাণী। যার মধ্যে অজস্র ভঙ্গি, অজস্র রূপ, অজস্র রং। তাই মানুষের মন কেবল 'উচিতে'র খাতে বইতে পারে না। অতএব প্রদোষ ছেলেকে বলে তার 'মায়ের বিজনেস'।

ছেলের সম্পর্কে কোনো চিন্তা মাথায় নেয় না প্রদোষ। আর এতবড়ো একটা ছেলে আছে তার,

এটা ভেবে যেন অস্বস্তি পায়। কিন্তু তার জন্যে তো কোথাও কোনো অভিযোগ ছিল না। কাজেই সুখেরও বিঘ্ন ছিল না। পরিচিত মহলে সকলেই তো জানত ওরা একটি সুখী দম্পত্তি। ওদের ভালোবাসাটা তুলনাস্থল ছিল। কারণ ওদের ভালোবাসার গোড়ার ইতিহাসটা যে বেশ সমারোহময় ছিল।

আর এখন?

এখন প্রদোষ অনুপস্থিত নন্দিতার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনুচ্চারিত উচ্চারণে বলে চলেছে, হ্যাঁ, স্বীকার করেছি হে মহিয়সী মহিলা, একদা আমি তোমার জন্যে পাগল হয়েছিলাম। তোমার জন্যে লজ্জা-সরম বিসর্জন দিয়েছি, দিনের পর দিন কলেজ কামাই করেছি, পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ করেছি, নিজের বাড়িতে লড়েছি, তোমাদের বাড়িতে লড়েছি।...

তারপর তোমাকে জিনে এনে বিজয়লব্ধ ঐশ্বর্য গলায় ঝুলিয়ে বেড়িয়েছি। অনেকদিন ধরে বেড়িয়েছি। কিন্তু যদি আজ আমার তোমাতে ক্লান্তি আসে, সেই আদি প্রেমিক শিবঠাকুরের মতো সতীর মৃতদেহের ভার কাঁধে করে বেড়াব?

কেন?

কেন তা চাইবে তুমি?

তুমি থাক তোমার মনে, আমি থাকি আমার মনে। চুকে গেল। যা ছিল, কিন্তু আজ আর নেই, সে জীবন আর চেও না তুমি।

কিন্তু আর তো নন্দিতা তা চাইছে না। চেয়েছিল। প্রথমে চেয়েছিল, এখন নন্দিতা বিচ্ছেদ চাইছে। নন্দিতা ওই অপমানকর দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখতে চাইছে না।

অথচ প্রদোষ তা চাইছে না। প্রদোষ ওই সব গণ্ডগোলের মধ্যে যেতে নারাজ। প্রদোষ জানে, চারুতোষের স্ত্রীর সঙ্গে তার এই লীলাসঙ্গিনীর সম্পর্কটাই শেষ কথা। কোনো কবি-কল্পনা, কোনো রোমাঞ্চময় স্বপ্নের মধ্যেও সে সম্পর্ক জীবন-সঙ্গিনীতে পর্যবসিত হবার প্রশ্ন নেই। আর তা চায়ও না প্রদোষ।

এই দায়হীন ভারহীন শুধু ভালোলাগার জীবনে যে মাধুর্য, সেটাই তো কাম্য। প্রেমের উপর যেই দায় চাপে, ভার চাপে, সে ক্লিষ্ট হয়ে যায়। এখন কি বিশ্বাস হয়, একদা প্রদোষ নন্দিতার জন্যে পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ করেছে? অথচ করেছে তা। আর তখন প্রদোষের নন্দিতাকে অসহ্য লাগছে।

কিন্তু নন্দিতাও তো সে একই দোষে দোষী। নন্দিতার বান্ধবী তো কম চেষ্টা করছে না ওকে সেদিনের কথা মনে পড়াতে! শিখা তো সেই তাদের মধুর রোমাঞ্চময় উন্মাদ-আবেগময় দিনগুলির সাক্ষী। শিখার জীবনে কখনও প্রেমের পদপাত ঘটেছে কিনা, শিখার অন্তরঙ্গ বান্ধবী নন্দিতাও জানে না। অতএব ধরে নিতে হবে ঘটেনি।

কিন্তু শিখা ওদের সেই 'ঘটনা'র দিনগুলি নিখুঁত মনে রেখেছে। তাই শিখা ওকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, 'প্রদোষের সেই বেলা চারটে থেকে পার্কের বেঞ্চে বসে রোদে পোড়ার কথা তোর মনে আছে নন্দিতা?...ওর সেই আমাদের কলেজের পথে ফুটপাতে পায়চারি করার কথা?...আচ্ছা, আর সেই একদিন তোকে নিয়ে সরে পড়ে স্টিমারে বেড়িয়ে আনা? শেষ অবধি আমাকে তোদের বাড়ি গিয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিতে হল, তুই রাত আটটা পর্যন্ত আমাদের বাড়িতেই ছিলি!...প্রদোষের সেদিন কী কৃতজ্ঞতা! আর—'

নন্দিতাও এখন প্রদোষের মতোই অনমনীয়। তাই নন্দিতা বিরক্ত গলায় বলে, 'থাম্ থাম্, তোকে আর পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে আসতে হবে না। এখন বুঝছি ওসব স্রেফ্ জোচ্চুরি।'

শিখা বিষণ্ণ গলায় বলে, 'আজ হয়তো তাই দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু তখন সেটা জোচ্চুরি ছিল না নন্দিতা!'

'আমি বিশ্বাস করি না। যদি খাঁটি হত তাহলে আজ এভাবে—'

'মানুষ মাত্রেরই মতিভ্রম হতে পারে নন্দিতা, এখন ওকে পেত্নীতে পেয়েছে, তাই ওর বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গেছে। কিন্তু এ ভুল ওর ভাঙবে। আমি বলছি, দেখিস তুই—'

নন্দিতা তার সুন্দর মুখটা বিকৃত করে বলে, 'ওঃ, তাহলে বলতে চাস্ তোর এই ভবিষ্যৎ বাণী ফলবার আশায় প্রতীক্ষার প্রহর গুনব বসে বসে? কবে তাঁর ভ্রষ্টবুদ্ধি ফিরে আসবে, কবে তিনি আবার এই দাসীর দরজায় এসে দাঁড়াবেন! গলায় দড়ি আমার! আমি তোর ওই যীশুখ্রিস্টের প্রেমের বাণী শুনতে চাই না বাবা, সাদা বাংলা হচ্ছে—ওকে আমি কোর্টে দাঁড় করাব।'

হ্যাঁ, এই সংকল্পে বদ্ধপরিকর হয়েছে নন্দিতা, এই মন্ত্র জপ করছে—ওকে আমি কোর্টে দাঁড় করাব। ওর সব কেলেঙ্কারী ফাঁস করে দেব। ষোলো বছর ধরে যে ফাঁকির মধ্যে বসে নির্বোধের মতো ঠকে এসেছি তার শোধ তুলব।

শিখা আবার বলে কিনা তখন সেটা ফাঁকি ছিল না। তার মানে খাঁটি-সোনার কণ্ঠহারটা আমার হঠাৎ একদিন পেতল হয়ে গেল! শিখা বলতে পারে, শিখা পুরুষজাতটার স্বরূপ জানে না। তাই উপদেশ দিতে পারে—ব্যাপারটাকে এতবড়ো করেই বা দেখছিস কেন?

এ যুক্তি প্রদোষও দিয়েছিল সেদিন, যেদিন চলে এসেছিল নন্দিতা। নন্দিতাকেও নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিল প্রদোষ। বলেছিল, 'ব্যাপারটাকে এতবড়ো করেই বা দেখছ কেন তা-ও তো বুঝছি না!'

'বুঝছ না?'

'সত্যিই বুঝছি না। কোথাও তো কিছু ব্যাহত হচ্ছে না তোমার! তোমার সংসারে তুমি যেমন ছিলে তেমনিই আছ, আমিও কিছু বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি না। বাইরে রাত্রিবাসও করছি না। শুধু তোমার সঙ্গে কপটতা না করে অকপটে স্বীকার করছি, তোমাতে আমি একনিষ্ঠ থাকতে পারছি না। শুধু এই—'

'শুধু এই! তা বটে।'

নন্দিতা অনেক ঢেউ খেয়ে তবে অকূলে নৌকো ভাসাতে নেমেছিল, তাই নন্দিতা আর রুদ্ধকণ্ঠ হল না। স্থির গলায় বলল, 'আমার সংসার, এই ফাঁকিটাকে আর হজম করা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু ভেবে দেখ—'

প্রদোষ ট্রাউজারের পকেটে হাত দিয়ে পায়চারি করতে করতে বলেছিল, 'এই ফাঁকিটাকে নিয়ে হই চই করে বেড়ালে—মান-সম্ভ্রম কমবে বৈ বাড়বে না।'

'তোমার ওই মেকি মান-সম্ভ্রমের দাম আমার কাছে কানা-কড়িও নয়।'

'তবে ব্যাপারটা হবে এই', প্রদোষ বলেছিল, 'তোমার আজকের এই 'ফাঁকি'র খবরটা এমন চাউর করে বেড়ালে, তোমার বিগত ষোলো বছরের জলজ্যান্ত জীবনটাও স্রেফ্ ফাঁকির খাতায় জমা হবে। লোকে ভাববে—'

'জলজ্যান্ত জীবন?' ঘৃণায় মুখটা বাঁকিয়েছিল নন্দিতা, 'আগাগোড়াই ধাপ্পাবাজি ছিল তোমার, এখন বুঝছি! লোকে যদি সেটা বুঝতে পারে বুঝবে।'

তখন প্রদোষ একটু যেন বিষণ্ণ গলায় বলেছিল, 'আগাগোড়াই ধাপ্পাবাজি ছিল এতটা না-ভাবলেও পারতে নন্দিতা! যখন ছিল, সেটা খাঁটিই ছিল।'

নন্দিতা অপমানের জ্বালায় জ্বলছিল।

নন্দিতা তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে, চিরকালের মতো চলে যাবার জন্যে, ছোট্ট একটা সুটকেসে দু-একটা জামাকাপড় ভরে নিচ্ছিল, রাগে হাত-পা কাঁপছিল তার, তাই মুখবিকৃত করেছিল। বলেছিল, 'চুপ করো, চুপ করো। একটি কথা বলতে এসো না। খাঁটি ছিল! নির্লজ্জ মিথ্যেবাদী!'

প্রদোষ হেসে উঠেছিল। হেসে বলেছিল, 'নির্লজ্জ একশো বার, কিন্তু মিথ্যেবাদী নয়। আজ হয়তো সে প্রেমের কিছু অবশিষ্ট নেই, কিন্তু এক সময় ছিল। আর তার মধ্যে ভেজাল ছিল না।'

কিন্তু কে বিশ্বাস করবে ভেজাল ছিল না? কে বিশ্বাস করবে যখন ভালোবেসেছে প্রদোষ নন্দিতাকে, প্রাণ দিয়েই বেসেছে। না, বিশ্বাস করা যায় না। কারণ এখন প্রদোষ পরকীয় রসে ডুবে পড়ে আছে। এখন চারুতোষ পালিতের স্ত্রীর সাপের মতো চকচকে দু'খানা হাত অহরহ আকর্ষণ করছে প্রদোষকে।

প্রদোষ তবু চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, 'রাগের মাথায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়াটা বড্ড সেকেলে হয়ে গেছে নন্দিতা, ওটা বাদ দিয়ে আর কিছু হয় না? মানে, আর কোনো নতুন একটা শাস্তি ঠিক কর না!—আর এটা তো ঠিক আমায় শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না, শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তোমার গৃহপালিত পোষ্যদের। তোমার এই 'গৃহিণীশাসিত সংসারে' ভৃত্যদের এমন অবস্থা যে, নির্দেশ ব্যতীত কোনো কাজই করতে পারে না তারা। তোমার ওই অঞ্চলের নিধি পুত্রকে এমন খোকা করে রেখেছ যে, মা ছাড়া তার বিশ্বভুবন অন্ধকার—'

এইভাবে ম্যানেজ করতে চেষ্টা করেছিল প্রদোষ। যেন নন্দিতার এই চলে যাওয়াটা একটা হাস্যকর ছেলেমানুষী! যেন নন্দিতা চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলছে।

কিন্তু নন্দিতা তখন মরিয়া। তাই নন্দিতা বলেছিল, 'ধরে নিতে হবে ওর মা মরে গেছে। হঠাৎ একটা মৃত্যু, সংসারে অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।'

'মৃত্যু! কিন্তু মৃত্যুর মধ্যে একটা সান্ত্বনা থাকে। নিরুপায়তার সান্ত্বনা। যেহেতু সেটা অমোঘ, অনিবার্য।'

'এটাকেও তাই বলে ভাবা হোক।'

'কিন্তু আমি বলছিলাম, মাত্র আমাকে, মানে মাত্র আমার হৃদয়টুকুকে বাদ দিচ্ছি বৈ তো নয়। সেই তুচ্ছ একটা হাইফেনের অভাবে এ সংসারের কী এমন ছন্দপতন হবে? বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি না আমি, আর্থিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি চাইছি না—'

'থামো, চুপ কর। নির্লজ্জ, বেহায়া, অসভ্য!' নন্দিতা জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে আরও জোরে জোরে হাতের কাজ সেরে নিয়েছিল।

আর সেই সময় আরও একবার মনে হয়েছিল প্রদোষের, নন্দিতার গায়ে কত বেশি মাংস!

আরও কিছু কথা-কাটাকাটির পর নন্দিতা বেরিয়ে গিয়েছিল।—গিয়েছিল, তবু প্রদোষ ভাবেনি সেই যাওয়াটা সত্যি চিরতরে যাওয়া হবে। ভেবেছিল সংসার-অন্ত-প্রাণ নন্দিতা ক'দিন ওর এই সাধের সংসার ছেড়ে থাকতে পারবে? বাপের বাড়ি বসে বসে ভাববে চাকররা ওর তোলা দামি চায়ের সেটগুলো বার করে ব্যবহার করে ভাঙছে কিনা, ওর ভাঁড়ারঘরের আধিপত্য পেয়ে একমাসের রসদ তিন দিনে শেষ করছে কিনা, ওর বাসন-কোসন, চাদর-পর্দা চুরি করে লোপাট করছে কিনা, আর ওর সাধের পুত্তুরটিকে সম্যক যত্ন করে খেতে দিচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে প্রধান।

স্বামীর কথা হয়তো ভাববে না রাগে অন্ধ হয়ে, কিন্তু টুবলুর কথা না-ভেবে পারবে না। এইসব ভেবে স্বস্তিতেই ছিল প্রদোষ, ছিল নিশ্চিন্তে। কিন্তু ক'দিন পরে জানল বাপের বাড়িতে যায়নি নন্দিতা।

সেরেছে! তবে কোথায়? রাগের চরম নিদর্শন দেখাতে কোনো মফঃস্বলে স্কুলে মাস্টারি করতে যায়নি তো? গল্পে-উপন্যাসে যা দেখা যায়। খোঁজ করতে লাগল। কারণ সংসারটা ছন্নছাড়া করতে চায়নি প্রদোষ। সমস্ত ছন্দ অব্যাহত রেখে ও শুধু জীবনে একটু নতুন রসের আমদানি করতে চেয়েছে।

আশ্চর্য, সেটা কি এতই বেশি চাওয়া? আচ্ছা, নন্দিতাই বা এই ষোলো বছরের পুরনো জীবনটাতে ক্লান্ত হচ্ছে না কেন? এ জীবন রসহীন লাগছে না কেমন ওর?

ওই অভ্যাসের সংসারে বাঁধা নন্দিতাকে করুণা করেছিল সেদিন প্রদোষ, তার বেশি নয়। কিন্তু এখন রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে তার। কারণ এখন শুনছে নন্দিতা ডিভোর্স চাইচে। বান্ধবীর বাড়িতে খুঁটি গেড়ে তার তোড়জোড় করছে। আর করছে হয়তো প্রদোষেরই টাকায়। সর্বস্ব তো নন্দিতার অধিকারেই ছিল। সেই অধিকারের সুখটা কিছুই নয়?

প্রদোষকে সে কোর্টে দাঁড় করিয়ে ছাড়বে, আর সেই সঙ্গে প্রকাশ করে দেবে চারুতোষ পালিতের স্ত্রীর সঙ্গে প্রদোষের কেলেঙ্কারীর কাহিনি। ইঁটের মতো কঠিন মুখে হঠাৎ একা ঘরেই অদৃশ্য নন্দিতার সামনে বুড়ো আঙুল দেখাল প্রদোষ। কিছু প্রমাণ করতে পারবে না হে, মহিলা! চারুতোষ নিজে সাক্ষী দেবে তার স্ত্রীর মতো পতিব্রতা সতী স্ত্রী দুনিয়ায় আর দুটি নেই।

তাছাড়া—কবে তুমি আমাদের দুজনকে একত্রে দেখেছ? না, তেমনভাবে কিছুই দেখনি। কারণ তুমি আগে টেরই পাওনি কে তোমার স্বামীর হৃদয় হরণ করেছে। হারানোর অনুভবটাতেই উন্মাদ হচ্ছিলে তুমি।

আমি, এই আমি, তোমার সত্যবাদী স্বামী নিজে মুখে যদি না-বলতাম, অন্ধকারেই থাকতে তুমি। এখন তুমি সেই সুযোগটি নিচ্ছ।

ঠিক আছে, দেখি তুমি কী করতে পার!

যদি তুমি নিজে এই ঘর-ছাড়ার কেলেঙ্কারীটা না করতে, হয়তো আমি তোমার প্রতি সামান্যতম মমতাটুকু অন্তত রাখতাম। কিন্তু আর এখন ওই মমতার প্রশ্নটুকুও থাকবে না।

যেন আক্রোশের মনোভাব নিয়েই বেরিয়ে পড়ল প্রদোষ চারুতোষ পালিতের বাড়ির লক্ষ্যে। খেয়াল করল না, আর একটা জায়গায় হয়তো একটু মমতার প্রশ্ন রাখা উচিত ছিল।

বাবার বেরিয়ে যাওয়া তাকিয়ে দেখল টুবলু তার দোতলার পড়ার ঘর থেকে। গাড়ির গর্জন শুনতে পেল, ধপাস করে দরজা বন্ধ করার শব্দটাও শুনতে পেল। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বসে রইল টুবলু হাতের বইটা টেবিলে ফেলে রেখে। টুবলু জানে বাবা কোথায় যাচ্ছে। শুধু আজ বলেই নয়। অনেকদিনই ধরেই জানে। কারণ অনেকদিন থেকেই তো বাবার অনিয়মিত গতিবিধি নিয়ে মায়ের অনুযোগ-অভিযোগ শুনছে। শুনছে তর্ক-ঝগড়া, আর কথা-কাটাকাটি।

এক একদিন রাত্রে উদ্দাম হয়ে উঠত মায়ের কণ্ঠ, আর মনে হত—মা বুঝি ফেটে পড়বে।

মনে হত, মা বুঝি এই দণ্ডে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। তা সেই বেরিয়েই গেল মা। রাত্রে না হলেও গেল। দিনে-দুপুরেই গেল। টুবলুকে একবার বলেও গেল না।

প্রথম ক'দিন কথাটা মনে করলেই টুবলুর চোখ দুটো জ্বালা করে উঠত, এখন আর করে না। এখন শুধু একটা দাহ! চোখে, মনে, সর্বাঙ্গে। একটা বেলা নাকি মা টুবলুকে চোখের আড়াল করতে পারত না। স্কুল থেকে এন.সি.সি-র ক্যাম্পে যাবার কথা হয়েছে, মা নানা ছল-ছুতোর টুবলুর (বহির্জগতে যার নাম কৌশিক) যাওয়া বন্ধ করেছে। টুবলু রাগ করলে মা কত তোয়াজ করে করে ভুলিয়েছে, কত প্রলোভন দেখিয়ে বশে এনেছে।

আর অন্য যে-কোথাও যেতে চাইলে? মা বলত, আহা-রে বাহাদুর সর্দার, তোমায় আমি একলা ছাড়ব? যা বেহুঁশ ছেলে তুমি। বলে নিজের হাত-পায়েরই ঠিক নেই তোমার! কেউ ডেকে না-খাওয়ালে তো তিনবেলা না খেয়ে পড়ে থাকবি।

তা কোথায় গেল তোমরা সেই মাতৃ-স্নেহের গৌরব?

টুবলু—না, টুবলু না বলে যাকে এখন কৌশিক বললেই বেশি মানাবে, সে মনে মনে তীব্র প্রশ্ন করে, কোথায় গেল? মনে হত অন্ধস্নেহে বিগলিত তুমি, কোথায় সেই স্নেহ-সমুদ্র?

তার মানে ছিলই না কোনোদিন সে জিনিস। তার মানে সবটাই তোমার 'শো' ছিল। ভাবতে গেলেই যেন মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে, সমস্ত অতীতটা তালগোল পাকিয়ে ঝাপসা হয়ে যায়। টুবলুর সেই মা, টুবলুর বিগত সমস্ত জীবনটা ভরে আছে যার অস্তিত্বে, সেই মা টুবলুর সঙ্গে কথা পর্যন্ত না বলে চলে গেল টুবলুর মুখে কালির প্রলেপ লাগিয়ে দিয়ে।

টুবলু কি আর বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে পারছে? রাস্তায় বেরোতে পারছে? জানলায় বারান্দায় পর্যন্ত দাঁড়ায় না টুবলু। ওর মনে হয় যেন বিশ্বসুদ্ধ লোক শুধু টুবলুর দিকেই তাকাচ্ছে। তাকাচ্ছে, আর ভাবছে এর মা এর বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। আর এখন—বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা তুলতে যাচ্ছে!

টুবলু আর ভাবতে পারে না।

টুবলুর সমস্ত শরীরটা ঘেমে যায়। তবে টুবলু একটা আতঙ্কের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ও নিজে কোনো বন্ধুর বাড়িতে না গেলেও বন্ধুরা পাছে ওর বাড়িতে আসে এই ভয়ে কোনো পরিচিত গলাই বিশেষ একটি জানলার নীচে থেকে ডেকে উঠল না 'কৌশিক! কৌশিক!'

না, এই ক'দিনের মধ্যে একদিনও না!

তার মানে কৌশিকের বন্ধুরা কৌশিককে ঘৃণা করছে। অথবা কৌশিকের এই পরিস্থিতিকে ভয় করছে। বড়োলোক বাবার একমাত্র ছেলে কৌশিক, স্নেহ-বিগলিত মায়ের একমাত্র সন্তান, কাজেই কৌশিক ছিল বন্ধু-মহলে যেন মধ্যমণি। সেই কৌশিক এখন ঘৃণ্য, হাস্যাস্পদ।

যাক্, তবু এও ভালো। ঘৃণা করে ত্যাগ করেছে তারা কৌশিককে। যদি তারা নিষ্ঠুর কৌতুকে কৌশিককে বিঁধতে আসত তাহলে কৌশিককে হয়তো এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হত। কৌশিকের মা যেমন গেছে। নির্মম নির্লিপ্ত চিত্ত নিয়ে। মনে হত এ বাড়ির প্রত্যেকটি জিনিসের উপরই মায়ের অপত্য স্নেহ। এই বাড়িটার শোভা সৌন্দর্য আর পরিচ্ছন্নতা রাখবার জন্যে মা প্রাণপাত করতে পারে।

সেই প্রাণতুল্য বস্তুগুলোকে মা পথের ধুলোর মতো গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যেতে পারল? হঠাৎ যেন বিশ্বাসই হয় না কৌশিকের, মা তার এই প্রিয় জিনিস-পত্তরগুলি, যা সে বাঘিনীর মতো আগলাত, সে-সব আর কোনোদিন হাত দিয়ে ছোঁবে না। বিশ্বাস হয় না, মায়ের ওই তিন আলমারি শাড়ি ব্লাউজ, আরও কত কি যেন, মা কোনোদিন আর পরবে না।

কৌশিক সেই অবিশ্বাস্য কথাটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হওয়ার মতো ভয়ঙ্কর দুঃখের সময়ে ভাবতে চেষ্টা করে, কত লোকের তো মা মারা যায়, কৌশিকেরও তাই—কিন্তু মারা যাওয়ার মধ্যে তো শুধু ভয়ঙ্কর ওই কষ্টটাই থাকে, এমন লজ্জা থাকে কি?

আশ্চর্য! কৌশিক লজ্জায় মরে যাচ্ছে। অথচ কৌশিকের মা-বাবার মধ্যে লজ্জার লেশ নেই। না নেই।

সেদিনের সেই রাত্রেই জেনে ফেলেছিল কৌশিক। হ্যাঁ, যেদিন মা চলে গেল তার আগের রাত্রে।

গভীর রাত্রে, কৌশিক তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুম ভেঙে গেল একটা তীব্র চেঁচামেচির শব্দে। হতচকিত কৌশিক বিছানায় উঠে বসল। অনুমান করতে চেষ্টা করল এ গলা কার! তারপর ভয়ঙ্কর এক ভয়ে যেন পাথর হয়ে গেল কৌশিক। এ গলা কৌশিকের মায়ের গলা? মা এইরকম সব অকথ্য কথা বলছে?

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেঙেচুরে তছনছ করে, চাকর-বাকর কান ফাটিয়ে মা বাবাকে বলছে, 'ছোটোলোক, ইতর নীচ নোংরা, রাস্তার কুকুর।'

মায়ের সেই কোমল সুন্দর মুখটা থেকে অনর্গল বেরিয়ে আসছে এই সব গালিগালাজ? এই সব! আরও কত সব!

কৌশিক যে-সব কথার মানে জানে না, শুধু ছায়া-ছায়া একটা আতঙ্কের মতো যা চেতনার মধ্যে সবেমাত্র সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে, কৌশিকের মা সেই সব বলছে? জানা জগৎটায় এমন ভয়ানক অনিয়মের ঘটনা এর আগে ঘটতে দেখেনি। কৌশিক তাই ভয় পেল। তারপর কৌশিক একটা কাচের গ্লাস ভাঙার শব্দ পেল। কৌশিক একটা সিদ্ধান্তে এল।—বাবা তাহলে মদ খাচ্ছিল।

মা তাই—

কিন্তু তাই কি? আরও যে কী সব ভাঙছে মা আছড়ে আছড়ে। কী ও-সব? ফুলদানি? পুতুল? পাথরের সেই অ্যাশট্রেটা? হ্যাঁ, মা ভাঙছে। ওই আছড়ে ভাঙার শব্দগুলোর ওপর মায়ের গলার শব্দটাও যে আছড়ে আছেড়ে পড়ছে। 'ভাঙব, ভাঙব। তছনছ করে দেব তোমার মান-সম্ভ্রম, তোমার মুখোশ! তোমার জীবন ধ্বংস করে ছাড়ব!'

বাবার গলাও কিছু বলছে, কিন্তু সে ভাষা উদ্ধার করতে পারছে না কৌশিক। সে গলা অনুত্তেজিত। কৌশিক ভাবল তবে কি মা নয়? আর কেউ? কিন্তু আর কে? তাছাড়া—

কিছুদিন ধরেই তো বাড়িতে চলছে ঝগড়া অশান্তি। বাবা যে হঠাৎ খারাপ কিছু করছে, এবং মা তার প্রতিবাদ করছে, এটা টের পাচ্ছে কৌশিক। কিন্তু কি সেই খারাপটা ধরতে পারছে না। শুধু দেখছে বাবার রাত্রের খাওয়াটা অনিয়মিত হচ্ছে, রাত্রের ফেরাটা অনিয়মিত হচ্ছে।

কৌশিক ভাবত তাসের আড্ডায় দেরি করে বাবা। তারপর কৌশিক ভাবতে শুরু করল, মদ। নিশ্চয় মদ। কিন্তু আজ তো শুধু সেইখানেই থেমে থাকতে পারছে না কৌশিক। কৌশিকের কানের পর্দা ফুটো করে এক-একটা জ্বলন্ত শব্দ ঢুকে পড়েছে যে!—

'মিথ্যেবাদী, শয়তান! চরিত্রহীন, ময়লার মাছি, নর্দমার পোকা!' মা, মা জানত এ-সব কথা? মায়ের স্টকে ছিল এইসব শব্দ? যে মা, কৌশিক একদিন বাড়ির চাকরকে 'পাজী' বলেছিল বলে, ছেলের অধঃপতনে মরমে মরে গিয়েছিল।

কৌশিক তারপর বাবার উত্তেজিত গলাও শুনতে পেল, 'তুমি থামবে কি না?'

কৌশিকের মা বলল, 'না, থামব না।'

'তবে চেঁচাও'—কৌশিকের বাবা বলল। 'তবে এটা বোধহয় তোমায় শেখাতে হবে না, ধমকে ভালোবাসা আদায় করা যায় না। আর দুটো প্রাণকে একটা দড়ি দিয়ে একটা খোঁটায় বেঁধে রাখলেই তারা একাত্ম হয়ে যায় না।'

'তা যায় না। একাত্ম হয় শুধু—' আরও একটা কাঁচের বাসন ভাঙার শব্দ পেল কৌশিক। আর হঠাৎ কৌশিক ভয় থেকে মুক্ত হল। মাঝখানের দরজাটা খুলে ফেলল।

দুটো ঘরের মাঝখানে যে বন্ধ দরজাটা ছিল।

দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ রুক্ষ গলায় বলে উঠল কৌশিক, 'ভেবেছ কি তোমরা? বাড়িতে কাউকে ঘুমোতে দেবে না?'

হঠাৎ দুটো উত্তেজিত সাপ যেন মন্ত্রপূত হল। চুপ করে গেল।

কিন্তু কতক্ষণের জন্যে? বড়োজোর কয়েক সেকেন্ড। ফণিনী আবার ফণা তুলল, 'তুই ছেলেমানুষ, এর মধ্যে কথা কইতে এসেছিস কেন?'

কিন্তু টুবলু কি তখন আর ছেলেমানুষ ছিল? টুবলু হঠাৎ ভয়ঙ্কর এক ধাক্কায় বড়ো হয়ে ওঠেনি কি? তাই টুবলু কৌশিকের গলায় বলল, 'নিজেরা ছেলেমানুষের বেহদ্দ করছ বলেই বলতে হচ্ছে।'

'তুই থাম্।'

'না, থামব না। তোমাকেই থামতে হবে।' বলল কৌশিক জোর দিয়ে।

আর সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখের ভঙ্গিটা কেমন যেন বদলে গেল। মা বলল, 'আমায় থামতে হবে? তুইও তাই বলবি? ওঃ! অন্নঋণ? আচ্ছা, ঠিক আছে।'

সে রাত্রে আর গোলমাল হল না। তারপর দিনই চলে গেল মা। আর যাবার সময় টুবলুকে কিছু বলে গেল না।

টুবলুকে আর কেউ কিছু বলছেও না। সে জানে না মা কোথায় আছে। টুবলুর মাথায় কুশ্রী একটা লজ্জার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে কোথায় বসে বসে ষড়যন্ত্র আঁটছে খুব ঘৃণ্যতম একটা ঘটনা ঘটাবার।

'দাদাবাবু!' চাকরটা এসে দাঁড়াল। বলল, 'এখন কি খেতে দেওয়া হবে আপনাকে?'

'চাকর-বাকরদের সামনে মুখ তুলে কথা বলতে পারে না কৌশিক, তাই 'না' 'হ্যাঁ' ছাড়া বলাও হয় না কিছু। এখন 'হ্যাঁ' বলে দিলে আর একবার ডাকের সম্মুখীন হতে হবে না, তবু কৌশিক বলে ফেলল, 'না'।

চাকরটা চলে গেল। ওরাও কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছে বইকি! 'মা' সত্যিই চিরকালের মতো চলে যাবে, এটা অবিশ্বাস্য, অথচ সেই অবিশ্বাস্য কথাটাই ক্রমশ সত্য হয়ে উঠছে। আর মায়ের উপর রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে তাদের। সঙ্গে সঙ্গে বাবুর উপর সহানুভূতিতে মন ভরে উঠছে।

আশ্চর্য! স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া আবার কোন্ সংসারে না হয়? বোঝা যাচ্ছে বটে ইদানীং বাবুর স্বভাব-চরিত্তির খারাপ হয়েছে, তা সেটাই বা কী এমন আশ্চর্য ঘটনা? তাই বলে চলে যাবে মানুষ ঘর-সংসার স্বামীপুত্তর ফেলে? এটাকে তারা ফ্যাশন ভাবছে, পয়সার গরম! অতএব তাদের মজলিশে এই নিয়ে আলোচনা এবং হাসাহাসির অন্ত নেই। পুরনো দিনের ভৃত্য নয়, তাই মনিব বাড়ির অশান্তিতে অশান্তি বোধ করে না, করে আমোদ বোধ।

তবে দাদাবাবুটাকে দেখলে কষ্ট হয়। আহা, বেচারার খাওয়া গেছে, খেলাধুলো গেছে, ঘুমও গেছে। তাই ওর সামনে বেশি কথা বলতে সাহস হয় না।

চাকরটা চলে গেল। আর একটু পরেই ঢুকল প্রদোষ। নন্দিতা গিয়ে পর্যন্ত এ ঘরে কোনোদিন ঢোকেনি সে, আজ ঢুকল। ঢুকেই বলে উঠল, 'তুমি নাকি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছ?'

কৌশিকের মুখটা শক্ত হয়ে গেল, কৌশিক কাঠ হয়ে বসে রইল।

বাবা আবার বলল, 'ওরা বলছিল, যাচ্ছ না। স্কুল কামাই করবার মানে কি?'

কৌশিক তবু তেমনিই বসে থাকে।

বাবা আবার বলে, 'ও রকম করার কোনো মানে নেই। কাল থেকে স্কুলে যাবে।'

এবার কাঠের মুখ কথা বলে ওঠে, 'না!'

'না? স্কুলে যাবে না?'

'না।'

'চমৎকার! তাহলে তুমি হবেটা কি? রাস্তার ঝাড়ুদার?' প্রদোষ ভাবছিল টুবলুকে শাসন করছে সে। প্রদোষ ভেবে দেখেনি টুবলু নামের সেই সর্বদা-আহ্লাদে-উছলে-পড়া ছেলেটা আর নেই। সে ছেলেটা মরে গেছে। তার চেয়ারে যে বসে আছে সে একটা বড়ো ছেলে। যার নাম কৌশিক।

তাই প্রদোষকে শুনতে হল, 'রাস্তার ঝাড়ুদাররা আমাদের থেকে অনেক ভালো।'

'ওঃ, তাই নাকি? তা বেশ, জ্ঞান যখন জন্মেই গেছে, তখন এটাই ভাবা উচিত, নিজের আখেরটা গুছিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

কৌশিক তিক্ত গলায় বলল, 'আচ্ছা, মনে রাখতে চেষ্টা করব।'

প্রদোষ চলে যাচ্ছিল। আবার ফিরে এল।

বলল, 'তা তুমিই বা কেন একবার চেষ্টা করলে না, মায়ের রাগ ভাঙাবার? অনেকটা তোমার ওপর রাগ করেও—'

'কথা ভালো লাগছে না আমার। মাথা ধরেছে।' বলে উঠে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়াল কৌশিক।

প্রদোষ একবার দাঁতে দাঁত পিষল, তারপর হঠাৎ শীস দিতে দিতে বেরিয়ে গেল।

বিপাশা বলল, 'কী ব্যাপার এত রাত্রে আবার?'

প্রদোষ মুখে একটু ব্যঞ্জনাময় হাসি ফুটিয়ে বলল, 'ঢুকতে দেবেন না বুঝি?'

হ্যাঁ, 'আপনি' বলেই কথা বলে ওরা।

কারণ পালিশটা হারাতে হাজী নয়, রাজী নয় মুখোশটা খুলতে। কেউটে সাপ খেলাবে, তবু ভাব দেখাবে যেন রবারের সাপ নিয়ে খেলছে।

ব্যঞ্জনার হাসি বিপাশাও হাসতে জানে বৈকি। সেই হাসির সঙ্গে তীক্ষ্ণ কথার হুল বসায় সে, 'না-দেওয়াই তো উচিত।'

'তাহলে ফিরে যেতে হয়।'

বিপাশা মুখ টিপে হাসে, 'আমিও তাই বলছি।'

'এক পেয়ালা কফি না-খেয়ে নড়ছি না। হঠাৎ ভীষণ ইচ্ছে জেগে উঠল—'

'রাত্তির এগারোটায় আর কফি খায় না।'

'এগারোটা নয়, পৌনে এগারোটা।'

'ওই একই কথা।'

'দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রইলেন মনে হচ্ছে। সত্যিই ঢুকতে দেবেন না নাকি?'

'ভাবছি—'

'অপমানিত হচ্ছি কিন্তু।'

'হচ্ছেন বুঝি?'

হাসির ছুরি ঝলসায়। 'তাহলে তো দরজা ছাড়তেই হয়। শেষে পরে আবার বন্ধু এলে লাগিয়ে দেবেন!'

'বন্ধু এলে?'

প্রদোষের চোখের কোণে এক ঝিলিক আগুন জ্বলে ওঠে, 'পালিত ফেরেনি এখনও?'

'কোথায়! বারোটার আগে কবে ফেরে? পকেটের সব টাকা ফুরিয়ে গেলে তবে তো ফিরবে।'

ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে বসে প্রদোষ।

সোফায় গা হেলিয়ে বলে, 'আচ্ছা, ও কেন তাস খেলে?'

'খেলতে জানে না বলে খেলে।'

'বাস্তবিক, আপনার বারণ করা উচিত। রোজ যখন হারে।'

বিপাশা মুচকে হেসে বলে, 'হারাই ওর ভাগ্য। সব খেলাতেই হারছে।'

'তার মানে ওর পার্টনার আনাড়ি।'

'যা বলেন।'

প্রদোষ চঞ্চল গলায় বলে, 'ও সত্যি বারোটার আগে ফেরে না?'

বিপাশা আবারও সেই হাসি হাসে, 'গ্যারান্টি দিতে পারছি না। এক্ষুনিও এসে যেতে পারে।'

'তার মানে ভয় দেখাচ্ছেন?'

'কী আশ্চর্য, এর মধ্যে আবার ভয়ের প্রশ্ন কি? এখন বলুন পুনরাগমনের হেতুটা।'

'যদি বলি হতভাগ্য আশ্রয়হীন, আশ্রয় চাইতে এসেছে?'

বিপাশা বলল, 'মনে করব তামাশা করছেন।'

'দেখছি লোকের মর্মান্তিক যন্ত্রণা আপনার কাছে তামাশার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়! এই সব মেয়েকেই সাধুভাষায় বলে পাষাণী।'

'তা পাষাণী দেখতেই তো আপনি অভ্যস্ত।' বিপাশার সব মুখটা বিদ্রুপে কুঁচকে যায়।

'তা যা বলেছেন, সাধে বলি হতভাগ্য!'

'গিন্নির গোঁসা ভাঙেনি?'

'কখন আর ভাঙল? এই তো ঘণ্টা দেড়েক আগে গেছি। এর মধ্যে আর—'

'এক মুহূর্তে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল তছনছ হয়ে যেতে পারে।'

'পারে? আপনি বলছেন পারে? স্বর্গ-মর্ত্য তছনছ হয়ে যেতে পারে?'

'নিয়তিতে থাকলে পারে বৈকি।'

প্রদোষের চোখে আবার আগুনের ঝিলিক ঝলসে ওঠে, 'তাহলে দায়ী হচ্ছে নিয়তি?'

'তা বলে সব ক্ষেত্রে নয়'—বিপাশা হেসে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটা ভারী কাঁচের ফুলদানি টেবিল থেকে তুলে উঁচু করে ধরে বলে ওঠে, 'যেমন ধরুন, এইটাকে যদি ধরে আছাড় মেরে ভাঙি, সেটার জন্যে নিয়তিকে দায়ী করব না।'

প্রদোষ উঠে দাঁড়িয়েছিল, চঞ্চল পায়ে এদিক-ওদিক করছিল, আবার ঝুপ করে সোফায় বসে পড়ে একটা অদ্ভুত হাসি হেসে বলে, 'হাতিয়ার হাতে রাখছেন? এত ভয়?'

বিপাশার কাঁধের কাপড় খসে পড়েছিল, বিপাশা ফুলদানিটা নামিয়ে রেখে ধীরে-সুস্থে 'চ্যুত অঞ্চল' বিন্যস্ত করে অবোধের গলায় বলে, 'ভয়—হাতিয়ার—এসব অদ্ভুত শব্দগুলো ব্যবহার করছেন কেন বলুন তো? বিরহের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে বুঝি?'

প্রদোষ ওই বাঁকানো ঠোঁটের অসাধারণ কুটিল একটা ভঙ্গির সঙ্গে নিতান্ত সাধারণ ওই তামাশার কথাগুলো মেলাতে পারে না, তাই প্রদোষ আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে দাঁড়ায়, বলে, 'যদি বলি তাই? যদি বলি এই বিরহ আর বরদাস্ত হচ্ছে না?'

'তবে যান গিয়ে পলাতকার পায়ে ধরুন গে।'

'তার কথা ছাড়ুন', প্রদোষ উত্তেজিত গলায় বলে, 'ওই এক সেন্টিমেন্টাল মহিলাকে নিয়ে জীবন বিষময় হয়ে গেল আমার। অকারণ খানিকটা সিন্ ক্রিয়েট করে—ছেলেটিও হয়েছেন মায়ের উপযুক্ত।'

'ওকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিন না।' বিপাশা সচিবের ভূমিকা নেয়, 'বাইরে কোনো বোর্ডিংয়ে। তাতে ওর মন ভালো থাকবে।'

'আমি তা ভেবেছি', প্রদোষ সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে, 'কিন্তু যা একবগ্গা, হয়তো যেতেই চাইবে না।'

বিপাশা ক্রূর হাসি হাসে, 'তাহলে নাচার। তবে শুনছি তো গিন্নি কেস ঠুকছেন।'

প্রদোষ ওই কালো-রঙা মুখের গাঢ় রক্তিম ঠোঁট দুটোর দিকে চেয়ে দেখে, যেন কোন্ এক অজানা দেশের ভয়ঙ্করী পাখি, ওই চড়া রঙের ঠোঁট দুটো দিয়ে ঠুকরে তুলে নিতে এসেছে প্রদোষের সারা জীবনের স্বস্তি শান্তি, সভ্যতা সম্ভ্রম, অতীত ভবিষ্যৎ।

প্রদোষের শক্তি নেই ওর কবল থেকে সেগুলি রক্ষা করবার। অতএব প্রদোষ নিয়তিকে মানবে। নিজেকে নিয়তির হাতে সমর্পণ করবে। প্রদোষ ভাববে—শুধু কি আমিই একলা? জগতের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ এই নিয়তির দাসত্ব করছে না? প্রদোষের ঘটনার অনেক আগে লেখা হয়ে গেছে, 'তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ। প্রদোষ বিহ্বল গলায় বলে, 'চুলোয় যাক ও-কথা।'

'চুলোয় যাক?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি ওসব কেয়ার করি না। ও-ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়। অনেক বলেছিলাম—অকারণ কতকটা কেলেঙ্কারী করার মানে হয় না। তা কানেই নিলেন না। আমাকে কোর্টে দাঁড় না-করিয়ে ছাড়বেন না।'

পাখির ঠোঁট দুটো আগুনের মতো জ্বলে।

'গিন্নির অবাধ্য হচ্ছেনই বা কেন?'

'হচ্ছি কেন?' প্রদোষ হঠাৎ উঠে সেই চকচকে সাপের মতো নিরাভরণ আর নিরাবরণ হাত দুটোর মূল অংশটা চেপে ধরে উত্তেজিত গলায় বলে, 'বলব—কেন হচ্ছি?'

গাঢ় রাত্রি, নির্জন ঘর, স্বামী নেই বাড়ি, তবু একবিন্দু বিচলিত হয় না বিপাশা। শুধু আস্তে কৌশলে হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে অবহেলার গলায় বলে, 'থাক্! আপনার গৃহবিবাদের কাহিনি শুনে আমার লাভ কি?'

'বিবাদটা যে আপনাকে কেন্দ্র করেই।'

'ওমা, সেকি?'

বিপাশা আকাশ থেকে পড়ে, 'আমি আবার হঠাৎ আপনাদের কি বলে—দাম্পত্য জীবনের মাঝখানে গিয়ে পড়লাম কোন্ অধিকারে? এত বাজে কথাও বলতে পারেন! দাঁড়ান, কফি খান একটু—না-খেয়ে নড়বেন না মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি বিদায় হবেন।'

বিপাশা দরজার দিকে এগোয়।

প্রদোষ তীব্র আর তীক্ষ্ণ হেসে বলে, 'বেহায়াদের কাছে সব হিন্টই ব্যর্থ। যদি বলি আজ আর শুধু হাতে বিদায় নেব না প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছি?'

'সর্বনাশ! একেবারে প্রতিজ্ঞা! আরে চারু এসে গেল মনে হচ্ছে যেন। গাড়ির শব্দ হল।' বলে টুক করে কেটে পড়ে বিপাশা?

নাগিনী-কন্যা তার সাপের ঝাঁপিটা একটুখানি খোলে আর বন্ধ করে ফেলে। দেখতে দেয় না সত্যি কি আছে। কিন্তু পালিত এসেছে বলে অবহিত করিয়ে দেবার কি ছিল? কবেই বা এসময় সজ্ঞানে বাড়ি ফেরে চারুতোষ পালিত?

আর সজ্ঞানে যখন থাকে? তখন তো বড়ো বেশি অজ্ঞান! তাই বন্ধুকে দেখে যেন হাতে চাঁদ পায়।

বলে, 'আপনাকে দেখে আমার ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে হচ্ছে। ভীষণ টায়ার্ড ফিল্ করছি, অথচ গ্লোবের দুটো টিকিট কাটা রয়েছে, আর মিসেসকে কথা দেওয়া রয়েছে! অনুগ্রহ করে যদি এই ঘণ্টাতিনেক সময়টি আমার হিতার্থে ব্যয় করেন!'—এই হচ্ছে চারুতোষ।

কাজেই চারুতোষ যদি রাত বারোটায় বাড়ি ফিরে দেখেও তার বাড়ির সন্ধ্যার অতিথি দ্বিতীয় আবির্ভাবে আবার মধ্যরাতের অতিথি হয়েছে, শানানো ছুরি নিয়ে অথবা জিভে ছুরি শানিয়ে তেড়ে আসবে না।

তবু ঘোষণাটা করে গেল বিপাশা। হয়তো সত্যিও নয়, হয়তো গাড়ির শব্দ পায়নি, তবু এইভাবেই ঘুঁটি চালে বিপাশা।

খানিকটা পরে যখন কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে ফিরে এল বিপাশা, তখন ঘরের উষ্ণ বাতাস মিইয়ে গেছে। প্রদোষ সেই 'মিয়োনো'র প্রতীকের মতো বসে আছে পাইপটা ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে।

প্রদোষ হাত বাড়াল না চট করে, শুধু সোজা হয়ে বসল, বলল, 'মুখে যতই সাহস দেখান, আসলে আপনি একটা ভীরু মহিলা।'

'ভীরু?' বিপাশা একটু বাঁকা হাসি হেসে বলে, 'কে? আমি?'

'নিশ্চয়।'

'তা বেশ। ভীরুই। নিন, এখন এটা খান।'

'দিন'—হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা ধরে প্রদোষ, তার সঙ্গে পেয়ালাধরা হাতটাও। বলে, 'যতটুকু লাভ। নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক।'

'বাকির কোনো খাতাই নেই!' বিপাশা বলে গম্ভীর গলায়।

প্রদোষ হাতটা ছেড়ে দেয়। বলে, 'রাগ করলেন তো?'

'সেই তো মুশকিল, আপনারা চির-রহস্য। বোঝা যায় না কোন্‌টা আপনাদের সত্যি, আর কোন্‌টা তামাশা। কোন্‌টা পছন্দ করছেন, কোন্‌টা পছন্দ করছেন না।'

'ওঃ, সব কিছুই বুঝে ফেলতে চান? খুব সাহস তো!'

'নাঃ, সাহস আর কোথায়?' প্রদোষ হতাশ গলায় বলে, 'ঠিকই বলেছেন, ভীরু আমি। ভালো ভালো নভেলের নায়করা কখনও আমার মতো এমন অনুকূল অবস্থাকে অপচয় করে না।'

বিপাশা হঠাৎ ভারী ঘরোয়া বৌয়ের সুর আনে গলায়। বলে, 'নভেলের কথা নভেলেই মানায়।'

প্রদোষ কফির পোয়ালাটা হাত থেকে নামায়। প্রদোষের চোখের কোণায় আগুন জ্বলে ওঠে। 'কেন, শুধু নভেলেই বা মানাবে কেন? নভেলের বাইরেই বা মানাবে না কেন? মানুষকে নিয়েই তো নভেল।'...

'তা হোক', বিপাশা তার গলায় সেই ঘরোয়া সুরটাই বজায় রাখে, তবু একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না, অবস্থা অনুকূল হলেই মানুষ পশু হয়ে উঠে বন্ধুর বিশ্বস্ততা নষ্ট করে তাঁর স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, অথবা মেয়েরা সুযোগ, অথবা বলা যেতে পারে কুযোগ, জুটলেই এক মুহূর্তে সততা সভ্যতা পবিত্রতা, সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে বসতে পারে! অথচ, আপনাদের ওই আধুনিক সাহিত্যের পাতা খুললেই এই সব ঘটনা।'

বলে, এই রকম সুন্দর আর সৎকথা মাঝে মাঝেই বলে বিপাশা, শুধু ওর গলার সুরের সঙ্গে চোখের কটাক্ষের মিল থাকে না।

এখনও রইল না।

প্রদোষ ওর কটাক্ষের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে বলে, 'তার কারণ হচ্ছে আধুনিক লেখকেরা ধরে ফেলেছে আসল মানুষটা হচ্ছে ওই। সভ্যতা নামের একটা আবরণ চাপিয়ে সেই আসল মানুষটাকে চাপা দিয়ে দিয়েই চালিয়ে যাচ্ছি আমরা।'

'তাহলে আর আসল মানুষটা বলছেন কেন? বলুন আসল জানোয়ারটা!'

প্রদোষ হেসে ওঠে। 'তা, তাও বলতে পারেন। পোশাক-পরিচ্ছদ ঢাকা এক-একটা জানোয়ারই। মানুষ যে তার ওপর দেবত্ব আরোপ করতে চায়, সেটা হচ্ছে কবির কল্পনা। এই আমি এই মুহূর্তে জানোয়ার হয়ে উঠতে পারি—'

'ওরে সর্বনাশ!' চোখের কোণে বিদ্যুৎ খেলিয়ে বিপাশা ভয় পাওয়ার অভিনয় করে বলে ওঠে, 'তাহলে তো আত্মরক্ষার্থে সরে পড়াই উচিত।'

বলে, কিন্তু সরে পড়ে না। আর তার নিরুদ্‌বিগ্ন মুখচ্ছবি দেখে মনেও আসে না আত্মরক্ষার গরজ তার বিন্দুমাত্রও আছে।

এক চোখে প্রশ্রয়, আর-এক চোখ শাসন নিয়ে সে যেন এক অভিনব খেলার মজা উপভোগ করে বসে বসে। আর হয়তো মানুষ যে জানোয়ার, প্রদোষের এই কথাটার প্রমাণপত্রের অপেক্ষা করে। এবং অপেক্ষায় হতাশ হলে ভাবে...ভীরু, ভীরু! পুরুষ জাতটাই এক নম্বরের ভীরু!... চারুতোষটাকে অমানুষ ভাবি, কোন্‌টাই বা মানুষ? অথবা জানোয়ার?

প্রান্তিক সোম টেবিল ছেড়ে অস্থির হয়ে উঠে পড়ল। লেখা আসছে না। কতদিন থেকেই আসছে না। প্রদোষ আর নন্দিতার জীবনে অশুভ গ্রহের ছায়াপাত প্রান্তিক সোমকেও বিপর্যস্ত করছে।

না, এই অবস্থাটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না প্রান্তিক। কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছে না, প্রদোষ আর নন্দিতা চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

নন্দিতার সেই সংসারটি, যার কেন্দ্রবিন্দুটিতে নন্দিতা ছিল স্থির, উজ্জ্বল দীপ্তিময়ী, যেখানে গিয়ে দাঁড়ালেই যেন হৃদয়ের আশ্রয় মিলত, একটি নির্মল কল্যাণের স্পর্শ পাওয়া যেত, সেখানে আর নন্দিতাকে দেখা যাবে না কোনোদিন। নন্দিতা নিজেকে সেখান থেকে উপড়ে নিয়ে যে একটা ভয়াবহ গহ্বর সৃষ্টি করে দিয়ে এসেছে, সেটাই শুধু চিরদিন 'হাঁ' করে গ্রাস করতে আসবে তার সংসারের অতিথিদের, বন্ধুদের।

কেন, নন্দিতা এই ভয়াবহতার নায়িকা হয়েই বা থাকবে কেন? প্রদোষ উচ্ছন্নে গেছে বলে সে-ও যাবে উচ্ছন্নে?

প্রান্তিক যেন ক্রমশ নন্দিতার ওপরই ক্রুদ্ধ হচ্ছে। যেন নন্দিতা ইচ্ছে করলেই এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আর সে ইচ্ছে নন্দিতার করাই উচিত। শুভবুদ্ধিকে ঠেলে রেখে অশুভ বুদ্ধির বশে চলবে কেন নন্দিতা?

প্রান্তিক সোম অতএব নন্দিতা ভৌমিকের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করতে আসে। কারণ নন্দিতাও তার বন্ধু। বন্ধুর বৌ হবার আগে থেকে বন্ধু।

প্রন্তিক সোমই ওদের বিবাহের ঘটক, বিবাহের সাক্ষী। বিয়ের পর দু'জনের ঘর সাজিয়ে দিয়েছিল প্রান্তিক সোমই, তাদের সন্তানলাভে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে গেলে ঢাক পিটিয়ে বেড়িয়েছে। আর প্রান্তিক সোমই সে ছেলেকে লায়েক করে তোলায় সক্রিয় সাহায্য করেছে।

ওদের সুখ যেন প্রান্তিকেরও সুখ, ওদের প্রেম যেন প্রান্তিকেরই গৌরব। অন্য অন্য বন্ধুদের কাছে কত সময়েই প্রান্তিক তার বন্ধু-দম্পতির নিটুট নির্ভেজাল প্রেমের উদাহরণ দেখিয়েছে, সে গৌরব-মন্দির সহসা ধূলিসাৎ হয়ে গেল প্রান্তিকের।

তাই প্রান্তিক এক বন্ধুর কাছে আবেদন করে ব্যর্থ হয়ে আর-এক বন্ধুর শুভবুদ্ধির দরজায় আবেদন করতে আসে। আধুনিক লেখক হয়েও তার যুক্তিটা সেকেলে। নইলে বলে কিনা—'বুঝলাম তো সবই, কিন্তু মনে রাখতে হবে সবকিছুর ঊর্ধ্বে—তুমি হচ্ছ 'মা'।'

নন্দিতা ওর এই সেকেলে ভাবপ্রবণতাকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে বলে, 'রাখ তোমার ওই পচা কথা, ওই মিথ্যে সেন্টিমেন্টের বেড়ি পায়ে পরিয়ে রেখে চিরটাকাল তোমরা মেয়েদের নিরুপায় করে রেখেছে। এই কেস-এর ব্যাপারে তুমি যদি কোনো সাহায্য করতে পার তো এসো এখানে, নচেৎ তোমার সেই শয়তান বন্ধুর কাছে বসে বসে সিগারেট ওড়াওগে। বলছ কি করে যে, এরপরে আবার আমি ওর ঘরে ফিরে যাব, আবার ওর স্ত্রীর পরিচয়ে সমাজে ঘুরে বেড়াব!'

প্রান্তিক ম্লান হাসে। বলে, 'এর চেয়ে অনেক বেশি নারকীয় পুরুষের স্ত্রীর পরিচয় নিয়েও অনেক মেয়েকে ঘুরে বেড়াতে হয়, নন্দিতা!'

হ্যাঁ, কখনও বলে মিসেস ভৌমিক, কখনও বলে নন্দিতা। আজ ইচ্ছে করে 'নন্দিতা'টাই ব্যবহার করছে। কল্যাণকামী বড়ো ভাইয়ের গলায় কথা বলছে। সেই গলাতেই বলে, 'এর থেকে অনেক বেশি নারকীয় পুরুষের স্ত্রীর পরিচয় নিয়েও অনেক মেয়েকে ঘুরে বেড়াতে হয় নন্দিতা! কারণ মেয়েরা স্বভাবতই ক্ষমাশীল।'

'ওর ওই নতুন প্রেমের নায়িকার চুনকালি-মাখা মুখটা একবার দেখুক ও।'

'চুনকালি?'

প্রান্তিক বিষণ্ণ হাসি হাসে, 'তুমি কি জান নন্দিতা, কতটা চুনকালির সঞ্চয় থাকলে তবে এদের মতো চরিত্রের মুখে চুনকালি মাখানো যায়? দেখবে তোমার এই আত্মসম্মান তখন আত্মহত্যার পথ খুঁজতে চাইবে।'

'ওঃ তোমার মতে আইনটা কেউ কাজে লাগাচ্ছে না?'

'লাগাবে না কেন, লাগাচ্ছে। হয়তো অনেকেরই অন্য প্রয়োজন আছে। কিন্তু তুমি নন্দিতা, তুমি কি আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবে?'

'রক্ষে কর! জীবনে আমার ঘেন্না ধরে গেছে।'

'তবে? তবে শুধু আপাতত সেপারেশনটাই থাক্ না! তাতে অন্তত—'

নন্দিতা রূঢ় গলায় বলে, 'ওঃ, তুমি বুঝি ওর চর হয়ে এসেছ? অথবা ওর উকিল? যাতে ওর সব দিক রক্ষে হয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠাটি অক্ষুণ্ণ থাকে, অথচ নতুন প্রেমের পানসিটিও ভাসে, তার ব্যবস্থাতেই? আমি ওর প্রতিষ্ঠা ঘোচাব, এই হচ্ছে আমার শেষ কথা।'

তা শেষ কথার পরও অনেক কথা বলে প্রান্তিক, অনেক শুভ প্রেরণা দিতে চেষ্টা করে। ছেলের মুখ চাইতে বলে, মা-বাপের মুখ চাইতে বলে, কিন্তু নন্দিতাকে সংকল্প থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না।

নন্দিতা বলে, 'একদিনে অসহিষ্ণু হইনি প্রান্তিক, একদিনে এ সঙ্কল্প করিনি। ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে তবেই—ও যদি সাধারণ চরিত্রচ্যুত লোকের মতো লুকোচুরি করত, আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলত অথবা ধরা পড়ে গেলে ঘটনাটাকে অস্বীকার করত আমি হয়তো ক্ষমা করতে পারতাম। সেখানে দুর্বলচিত্ত পুরুষের বাঁদরামি বলে উড়িয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু ও তা করেনি। ও দিনের পর দিন আমার মুখের ওপর বলেছে, 'তোমাতে আমার আর রুচি নেই।' বলেছে, আমাকে তুমি রেহাই দাও।' দেব রেহাই! তবে ওর ইচ্ছেমতো ওর সংসারের গিন্নি সেজে বাঁদীগিরি করে নয়।'

তবু প্রান্তিক ক্ষমার কথাই তোলে। বলে, মেয়েরা ক্ষমাপরায়ণা।'

'সে তোমার উপন্যাসের মহৎ নায়িকারা প্রান্তিক, রক্তমাংসের মানুষ মেয়েরা নয়। ক্ষমা? ক্ষমা মানুষ কাকে করে? অনুতপ্তকে, ক্ষমাপ্রার্থীকে। বল তাই কিনা? একটা নির্লজ্জ জানোয়ারকে ক্ষমা করতে যাব আমি?'

'কিন্তু চিরদিন সে জানোয়ার ছিল না, নন্দিতা! আজ শুধু সাময়িক একটা বিভ্রান্তি তাকে এমন করে তুলেছে!'

'থাম, তোমার ও-কথা বিশ্বাস করি না আমি। এখন বুঝছি চিরকাল ও আমায় ঠকিয়েছে।' হ্যাঁ এই চিন্তাতেই ক্ষেপে গেছে নন্দিতা। 'চিরকাল ঠকিয়েছে! আমায় সরল পেয়ে ধাপ্পা দিয়ে দিয়ে চালিয়েছে, আর আমি চোখে মায়ার কাজল পরে বসে বসে ঠকেছি। ছি ছি! আবার আমি সেই ভুলের সুখকে বুকে ভরতে যাব? গলায় দিতে দড়ি জুটবে না আমার!'

প্রান্তিক ক্ষুব্ধ গলায় বলে, 'তোমার এটা ভুল ধারণা, নন্দিতা! আমি বলছি এটা সাময়িক। বলতে পার এ একটা ব্যাধির মতো অকস্মাৎ এসে পড়েছে। তুমি তোমার স্বামীর সেই ব্যাধির কালে চিকিৎসার চেষ্টা না-করে তাকে ত্যাগ করে চলে এসেছ, চিরদিনের মতো ত্যাগ করতে চাইছ।'

'কী করব বল?' নন্দিতা কঠিন গলায় বলে, আমি 'পাপিয়সী। আমি তোমার ওই কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত বন্ধুকে নার্সিং করে সারিয়ে তুলতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করছি। তবে উদাহরণটা যুক্তি নয় প্রান্তিক, আত্মপ্রবঞ্চনাটা সত্য নয়। বল তো তুমি এক্ষেত্রে তোমার গল্পের নায়িকাকে দিয়ে কী করাতে? এই অপমান-শয্যাতেই ফেলে রাখতে তাকে? আর গালভরা গলায় উপদেশ দিতে, 'সকলের ওপর তুমি মা!' বলতে—'তোমার স্বামীর হঠাৎ একটি ছোঁয়াচে অসুখ ধরেছে, তুমি তাকে নার্সিং করে সারিয়ে তোলো'?...বল? বল শীগগির বলতে পারবে না, উত্তর নেই।'

প্রান্তিক আরও ক্ষুব্ধ গলায় বলে, 'জীবনকে গল্পের নায়িকার ছাঁচে ফেলতে যাওয়ায় সুখ নেই, নন্দিতা! তোমরা দীর্ঘ ষোলোটা বছর পরস্পরের সুখে-দুঃখে জড়িত হয়ে যে ঘরটা গড়ে তুলেছ, এক মুহূর্তের অসহিষ্ণুতায় সে ঘরটা ভেঙে গুঁড়ো করবে?'

'ঘর?' নন্দিতাও এবার একটা ক্ষুব্ধ হাসি হাসে। নিজে ভেঙে গুঁড়ো করছি না প্রান্তিক, ভেঙে ধ্বসে পড়ছে দেখে ছাদ-চাপা পড়ে সমাধি হবার পরিণাম এড়াতে পালিয়ে এসেছি। ঘর? ঘরের মূল্য তোমরা কতটুকু বোঝ? ঘর মেয়েদের জীবনের কতখানি তা জান?...বই লেখ বলেই সব বুঝে ফেলেছ তা ভেব না। তবু সেই ঘর যখন কোনো মেয়ে স্বেচ্ছায় ছেড়ে আসে, জেনো অনেক দুঃখেই আসে। তবু এও জেনো, ঘর যতই মূল্যবান হোক, আত্মসম্মানের থেকে বড়ো নয়। যদি তোমার মহৎ নায়িকারা তাকে সে প্রাধান্য দেন তো বুঝব হয় তাঁদের আত্মসম্মানবোধই নেই, নয় তাঁদের ওই ইঁট-কাঠের ঘরটার ওপরই নির্লজ্জ লোভ। তুমি আর আমায় সুবুদ্ধি দিতে এস না প্রান্তিক, কেস আমি করবই। ওকে আমি কোর্টে দাঁড় করাবই।'

প্রান্তিক হার মেনে ফিরে গেল। শিখা তো আগেই হার মেনেছিল। তবু সুমতি দিতে আসবার লোক আরও ছিল বৈ কি! নন্দিতা একটা বড়ো সংসারের মেয়ে তো বটে।

নন্দিতার দিদি এল গোড়ায়, বলল, 'তিলকে তাল করিসনে নন্দি, ইচ্ছে করে লোক হাসাসনি। প্রদোষের অধঃপতনে যদি বা লোকের তোর ওপরে সহানুভূতি আসছিল, তোর এই মামলা করার কেলেঙ্কারীতে সে সহানুভূতি ঘুচবে।'

'লোকের সহানুভূতি?' নন্দিতা ব্যঙ্গ হাসি হাসল, 'জিনিসটা একদম অসার দিদি, কিছুমাত্র ফুড্‌ভ্যালু নেই।'

'তা যাক্, মা-বাবার মুখটার দিকেও চাইবি না? একবার তো বিয়ের সময় যথেষ্ট মুখ পুড়িয়েছিলি, আবার সেই সাধের বিয়ের কেচ্ছা-কাহিনি নিয়ে—'

নন্দিতা গম্ভীর হয়। নন্দিতা সেই গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে, 'দেখ দিদি, মুখ যদি তাঁরা পুড়ছে কল্পনা করেই পোড়ার জ্বালা অনুভব করেন, আমার কি করবার আছে? ছেলেমেয়েরা বড়ো হলে যে তারা আর তাঁদের শিশুটি থাকে না, পুরো একটা মানুষ হয়ে ওঠে, তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, সমস্যা-প্রতিকার তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়, এগুলো মা-বাবারা ভুলে যান বলেই এত জ্বালা। আমার ভালোবাসাকে তাঁরা সমর্থন করেননি, বিয়ের সময় অকারণ প্রতিকূলতা করে অনেক কষ্ট দিয়েছেন আমায়, তারপর শুধু শুধুই কতকাল নির্লিপ্ত থেকেছেন, ঠেলে রেখেছেন, সে তো তোমার অজানা নয়! বলতে গেলে তোমার চেষ্টাতেই আবার তাঁরা আমাকে মেয়ে বলে স্বীকার করেছিলেন, নচেৎ হয়তো করতেন না। এখনও আমার জীবনের এই সমস্যার দিকে তাঁরা সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন না। জামাইকে নিন্দেমন্দ করলেও, তাঁর দোষটাকে ক্ষমার অযোগ্য বলে মনে করছেন না, ভাবছেন আমিই অসহিষ্ণু। আমিই বা তবে তাঁদের মুখের কথা ভাবতে যাব কেন?'

দিদি হতাশ হয়ে বলেন, 'তবে আর কি বলব। তবে টুবলুর কথাটাও একবার ভাবলে পারতিস!'

'ভেবেছি।'

নন্দিতা তীব্র গলায় বলে, 'তার সম্পর্কে বেশি ভাবনা না-করলেও চলবে। সে ঠিকই সাপের তেলে 'সলুই' হচ্ছে। সেও তার বাপের মতো আমায় আসে ধমকাতে, চুপ করাতে।'

'তা তোরা রাতদুপুরে পাড়া জানিয়ে ঝগড়া করবি—সে ছেলেমানুষ, মা ছাড়া জানত না—'

'দিদি থাম। ভয়ানক মাথা ধরেছে। মোটেই আর সে ছেলেমানুষ নেই। আমার জন্যে তার কিছুই এসে যাবে না। বাপের পয়সা আছে, চাকর-বাকর আছে, ইচ্ছে হলে বোর্ডিংয়ে পাঠাবে, দু-দিন বাদে বিলেত পাঠাবে, মিটে যাবে সমস্যা।'

'তাহলে বলতে হবে তোর সেই মাতৃস্নেহটাও মিথ্যে ছিল।'

নন্দিতা মুখটা অন্যদিকে ফেরায়। নন্দিতা ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'তাই ছিল তাহলে। তবে—এটা জেনো, আমার কাছে স্নেহ প্রেম সব কিছুর বড়ো আমি যে একটা মানুষ, সেই চেতনাটুকু।'

অতএব লড়াই বাধে।

একদিন মা এসে মাথার দিব্যি দিয়ে যান, বাপ এসে অভিসম্পাত, তবু বাধে।

পিসি-মাসি দাদা-বৌদি এবং আরও অনেকেই আসেন, শেষ অবধি রাগ করে ফিরে যান। কারণ নন্দিতা আপন সংকল্পে অটল।

শিখার বাড়িতেই রয়ে গেছে নন্দিতা, তাই শিখা আর সাহস করে বেশি কিছু বলে না, কি জানি বন্ধু যদি আহত হয়। যদি বলে আমাকে ভারস্বরূপ লাগছে বলেই বুঝি সেই নোংরা লোকটার সঙ্গে মিটমাট করতে বলছ?

আসল কথা নিয়তি। ওর বাড়া অমোঘ, ওর বাড়া অনিবার্য আর কি আছে? নন্দিতার এই নিয়তি, তাকে রোধ করবে এ সাধ্য কি নন্দিতার আছে? নেই।

তাই নন্দিতা অসাধ্য সাধন করে বেড়ায়! নন্দিতা উকিলবাড়ির মাটি নেয়, নন্দিতা পড়ে পড়েই বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন মুখস্থ করে ফেলতে বসে।

কিন্তু জায়গায় জায়গায় খটকা লাগছে। নিজের দিকে যেন উপকরণ কম। উকিল বলছে, 'শুধু স্বামী অনাসক্ত, অথবা আপনার প্রতি উদাসী, এটুকুতে কাজ হবে না। সলিড্ কিছু চাই। প্রমাণ করতে হবে মিস্টার ভৌমিক চরিত্রহীন।'

প্রমাণ!

নন্দিতা ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'তার গতিবিধিই তার প্রমাণ।'

'ওতে হয় না।' উকিল কুটিল হাসি হাসেন, 'আরও কিছু দরকার।'

অতএব সেই 'দরকারি' বস্তুটা নির্মাণ করতে বসেন উকিলবাবু। নন্দিতাকে বাঁশ-দড়ি খড়-মাটির জোগান দিতে হয়।

মিছে কথা? কে বলেছে মিছে কথা? নন্দিতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে এইটুকুই হয়তো বানানো, তাছাড়া? তবু খারাপ লাগে বৈকি! নিজেকেই যেন ক্লেদাক্ত মনে হয়, অশুচি মনে হয়। কিন্তু উপায় কি? নাচতে নেমে তো ঘোমটা চলে না। 'প্রত্যক্ষদর্শী'র মহিমা নিতে হলে যা মুখস্থ করবার, করতে হবে বৈকি। দিনরাত্তিরের চিন্তাতেই তাই লেগে থাকে একটা ক্লেদাক্ত অনুভূতি।

বিশ্বাস হয় না, কিছুদিন আগেও এই নন্দিতা প্রত্যেকটি বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যায় লক্ষ্মীর ঘট সামনে দিয়ে ধূপ-ধুনো ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করতে বসত। বিশ্বাস হয় না, পাঁজী দেখে নীলষষ্ঠী মহাষ্টমীর দিন বরের কাছে বায়না করত—'গাড়িটাকে চালিয়ে একটু এগিয়ে নিয়ে চল দিকিনি, একটু বড়ো গঙ্গায় স্নান করে আসি। এখানের ঘাটে যা কাদা, নামতে ইচ্ছা করে না।'

আর এও বিশ্বাস হয় না, রান্নার বই দেখে দেখে নতুন রান্না করে স্বামী-পুত্তুরকে খাওয়ানোর জন্যে দুপুরের বিশ্রামের হাতছানিকে আমল দিত না।

এ যেন আর এক নন্দিতা। লজ্জা-সরম বিবর্জিত, শালীনতা-অশালীনতা বিসর্জিত একটা প্রতিহিংসা-সাধনের যান্ত্রিক মূর্তি।

আবার একদিন প্রান্তিক এল। বলল, 'প্রদোষ একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

দপ্ করে জ্বলে ওঠে নন্দিতা, 'দেখা! আমার সঙ্গে! মানে?'

'মানে হচ্ছে—বলছিল টুবলুকে কোনো বোর্ডিংয়ে ভর্তি করে দেওয়া দরকার কি না সেই পরামর্শ করতে।'

'পরামর্শ? আমার সঙ্গে?' নন্দিতা ধারালো গলায় বলে, 'ন্যাকামিরও একটা সীমা থাকে, প্রান্তিক! কিন্তু দেখছি তোমার এই নির্লজ্জ বন্ধুটির কোথাও কোনোখানে সীমা নেই।'

প্রান্তিক মিটমাটের সুরে বলে, 'বন্ধুর হয়ে আমি কিছু বলতে আসিনি নন্দিতা, আর তোমরা

দু'জনেই আমার বন্ধু। আজ থেকে নয়। কিন্তু সে কথা যাক্, ও বলছিল, 'চিরদিনই তো ছেলেটাকে তার 'মায়ের বিজনেস' বলে ভেবে এসেছি, তাই ওর সম্পর্কে কি করা সঙ্গত বুঝতে পারছি না।'

নন্দিতা এ কথায় গলে না। নন্দিতা তীব্রস্বরে এইটুকুই জানিয়ে দেয়—প্রদোষ ভৌমিক খোকা নয়, আর তার ছেলেও খোকা নেই। নন্দিতার কোনো 'বিজনেস' নেই। নন্দিতা ধরে নিয়েছে ত্রিভুবনে তার কেউ নেই, সে কারও নয়।

প্রান্তিক বিষণ্ণ হয়ে বসে রইল একটু। প্রান্তিকের মনে ক্ষীণ একটু আশা জাগছিল, ছেলের প্রশ্ন নিয়ে হয়তো একবার ওরা মুখোমুখি হবে। আর সেই মুখোমুখির ঘটনাতেই হয়তো সমস্ত পরিস্থিতির মোড় ঘুরে যাবে। জগতে এমন ঘটনা ঘটে বৈকি। দুরন্ত রাগ, দুর্জয় অভিমান, হঠাৎ হয়তো একবার কাছাকাছি আসার সূত্রে ভেঙে যায়, গলে যায়। একটু নির্জনতায়, একবার চাহনিতে যে কী হয়, কী না হয়!

কিন্তু প্রান্তিকের আশা রইল না। নন্দিতা যেখানে দেখা করতে চাইল, সেখানে হৃদয়-সমস্যার সমাধান হয় না। তবু নন্দিতা সেই স্থানটাই নির্বাচন করল। বলল, 'বোলো দেখা করব। কোর্টে। তার আগে নয়।'

প্রদোষ হেসে বলল, 'কী হে ভগ্নদূত, দেখলে তো? বলিনি? চিনি তো মহিলাকে!'

প্রান্তিক রুক্ষ গলায় বলে, 'এমন ছিল না ও প্রদোষ, তুমিই করে তুলেছ।'

'অস্বীকার করছি না। যাক্, আমি আর টুবলুর ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাব না। ইচ্ছে হয় স্কুলে যাবে, না হয় স্কুলে যাবে না। রাস্তার রকবাজ ছেলে হয়ে ঘুরে বেড়ানোই যদি ওর, তোমরা গিয়ে কি বলে, নিয়তি হয়, তাই হবে।'

'তাই হবে?' প্রান্তিক রুক্ষগলায় বলে, 'আর তুমি সে দৃশ্যের দর্শক হয়ে দার্শনিক-সুখ অনুভব করবে?'

'উপায় কি?' প্রদোষ অবহেলাভরে ধোঁয়ার রিং সৃষ্টি করতে করতে বলে, 'সুদপদেশ দিতে গেলে নেবেন বাবু? জানো, ও আমার সঙ্গে কথাই বলে না। কোনো একটা প্রশ্ন করলে দশবারে উত্তর দেয়। আর যখন দেয় বা যেটা দেয়, মনে হয় তার থেকে একটা চড় বসিয়ে দিলেও অনেক কম অপমানিত হতাম। রাতদিন খোকামি করে বেড়াত, চকলেটের জন্যে বায়না করত, জামা-জুতোর ঠিক রাখতে পারত না। অথচ এখন দেখছি একটি বিষধর সর্পশিশু!'

প্রান্তিক ওর ক্ষুব্ধ মুখের দিকে তাকায়। প্রান্তিকের সহানুভূতি আসে না। প্রান্তিক রুক্ষ গলাতেই বলে, 'স্বাভাবিক।'

'স্বাভাবিক? হুঁ, সবাইয়ের সব কিছুই স্বাভাবিক, শুধু একটা মানুষ যদি কোনোখানে একটু জীবনের রস অন্বেষণ করতে চায়, সেটাই বিশ্বছাড়া অস্বাভাবিক। কি বল?' প্রদোষ বাঁকা গলায় বলে, 'কি হল? ভালো বাংলা বললাম না?'

প্রান্তিক রুদ্ধগলায় বলে, 'উচ্ছন্নে যাও তুমি।'

'আহা, সে আর নতুন করে কী যাব? গিয়েই তো বসে আছি। শুধু ভাবছিলাম তুমি যদি শ্রীমতী নন্দিতার এই দুঃসময়ে তাঁকে একটু হৃদয়রসস্পর্শ জোগাতে পারতে, বিবেকের দংশনটা একটু কম অনুভব করতাম।'

প্রান্তিক তীব্রস্বরে বলে, 'আর কোর্টে গিয়ে বলবার মতো দুটো কথাও পেতে।'

প্রদোষ হেসে ওঠে। হা হা করে অস্বাভাবিক হাসি।

তারপর বলে, 'তোমাদের সাহিত্যিকদের এই এক দোষ, বড়ো তাড়াতাড়ি ভিতরের কথা বুঝে ফেল।'

হঠাৎ ধমাস করে একটা শব্দ হয়।

এরা দুজনেই চমকে ওঠে।

তারপর লক্ষ করে বসবার ঘর আর টুবলুর পড়বার ঘরের মাঝখানে যে দরজাটা রয়েছে, টুবলু সেটা যতটা সম্ভব জোরে বন্ধ করে দিয়েছে। এটা তারই শব্দ।

প্রদোষ তিক্ত হাসি হেসে বলে, 'দেখলে তো? এই ছেলেকে আমি 'আহা মাতৃহীন' বলে পিঠে হাত বোলাতে যাব?'

না, টুবলুর পিঠে হাত বোলাতে যাবার সাহস শুধু তার অপরাধী বাপেরই নেই তা নয়, কারোরই নেয়। মাসি একদিন ডেকে পাঠিয়েছিল, হয়তো ওই পিঠে হাত বোলাবে বলেই, টুবলু যায়নি। অতঃপর মাসিই একদিন এল। পিঠ পর্যন্ত নিয়ে গেল হাত, বলল, 'চল্ না তোতে আমাতে তোর 'হাড়মুখ্যু' মা-টার কাছে যাই। দেখি তোকে দেখে কেমন মুখ্যুমি বজায় রাখতে পারে!'

কিন্তু টুবলু সে হাতকে আর অগ্রসর হতে দিল না। টুবলু ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর মাসিকে একটা কথাও না-বলে গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেল।

এরপর আর কার কাছে বসে থাকবে মাসি? কত আর অপমান সইবে? গজগজ করতে করতে চলে গেল, 'শনি, শনি ঢুকেছে বাড়িতে! সব কটার বুদ্ধিবৃত্তি ভব্যতা-সভ্যতা হরে নিয়েছে। নইলে—এই বাড়িই এই সেদিন পর্যন্তও ইন্দ্রভবন লেগেছে। আর এই সেদিনও ওই ছেলে 'মাসি একটা গল্প বল না' বলে কাছ ঘেঁষে বসেছে।'

তবে? তবে আর কি, শনিই। শনি ভিন্ন আর কোনো পাপগ্রহ এমন করে সব ধ্বংস করে দিতে পারে?

শিখাও সেই কথা বলে।

নন্দিতা যখন রুক্ষচুল শুষ্কমূর্তি নিয়ে এসে বাসায় ফেরে, শিখা বলে, 'শনি, শনিই ধরেছে তোকে। নইলে এমন বিটকেল মূর্তি হয়? এসে দাঁড়ালি যেন রাক্ষুসী! তোর বরের বাড়ির মতো বড়ো আর্শি আমার না থাক, তবু ওই ছোটো আর্শিতেই নিজেকে দেখেছিস কোনোদিন?'

নন্দিতা মৃদু হাসে, 'হঠাৎ আর্শিতে মুখ দেখে কী হবে?'

'কী হবে জানিস? পাঁচজনে তোর কী মুখখানি দেখছে সে বিষয়ে অবহিত হবি। লোকে বোধহয় নন্দিতা ভৌমিকের প্রেতাত্মা বলে মনে করছে তোকে।'

তা তাই-ই।

আর্শিতে না-দেখেও নিজেকে নন্দিতা ভৌমিকের প্রেতাত্মাই ভাবছে নন্দিতা। যে প্রেতাত্মাটা অহরহ শুধু ভাবছে, কবে প্রদোষ ভৌমিকের নামটা কাগজে কাগজে ছড়াবে। কবে প্রদোষ ভৌমিক সেই ছড়ানো নামের লজ্জায় গুটিয়ে যাবে মাথা হেঁট করে। এই শুধু এই নন্দিতার ধ্যান-জ্ঞান।

অতএব চালিয়ে যাও কুশ্রীতার যুদ্ধ। দেখা যাক যুদ্ধফল। যুদ্ধে নামলে তো দু'পক্ষই সমান নির্লজ্জ হয়ে উঠবে, সমান নোংরা, সমান ইতর। যুদ্ধের নিয়মই তো তাই। যুদ্ধক্ষেত্রের মানুষকে তো মানুষ বলে চেনা যায় না। কাজে কাজেই বলা যাচ্ছে না কে জয়ী হবে। তবু জয়ের মালা বুঝি প্রদোষ ভৌমিকের দিকেই হেলছে।

কারণ চারুতোষ পালিত নিজে এসে সাক্ষী দিয়ে গেছে—সমস্ত ব্যাপারটাই অমূলক। ভৌমিক, পালিত এবং মিসেস পালিতের মধ্যে যে একটি নির্মল বন্ধুত্ব আছে, সেই বন্ধুত্বের জন্য গর্ববোধ করে থাকে সে।

মিসেস ভৌমিক যে সেই নির্মল এবং পবিত্র বস্তুটিকে কালি-মাখা করে উপস্থাপিত করেছেন, সেটা কেবলমাত্র মেয়েলি ঈর্ষা-সঞ্জাত।

এরপর নন্দিতার পক্ষে শক্ত ভূমিতে দাঁড়ানো শক্ত হবে।

অতএব আবার উকিলের উপর চাই বড়ো উকিলের পরামর্শ। সেই ধান্ধায় ঘুরছে নন্দিতা—দিন নেই রাত নেই।

শিখা বলছে, 'তোকে ঠিক একটা বাঘিনীর মতো দেখতে লাগছে।'

'লাগুক'—বাঘিনীই তো হয়ে উঠেছে নন্দিতা!

কিন্তু খবরের কাগজগুলোকে 'বোবা'য় পেয়েছে নাকি? আইন আদালতের পাতাগুলো যেন তার সমস্ত তীক্ষ্ণতা আর সরসতা হারিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আছে।

কই, প্রদোষ ভৌমিক আর বিপাশা পালিতের নাম জড়ানো রসালো খবরগুলো কোথায়? যাতে দেশসুদ্ধ লোক টের পেয়ে যাবে প্রদোষ ভৌমিক নামের লোকটা কী চরিত্রের!

এ প্রশ্নে মুহুরি জীবনকৃষ্ণ হেসে ওঠে, বলে, 'এসব সংবাদ আর আজকাল কাগজে ওঠে না।'

'ওঠে না?'

'নাঃ। এ কেস তো আজকাল আকছার হচ্ছে। হাজারটা ডিভোর্স কেস ঝুলছে, কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা দেবে। কাগজে অত জায়গা নেই।'

'কাগজে অত জায়গা নেই?'

নন্দিতা হঠাৎ যেন ঝুলে পড়ে। নন্দিতার সব উত্তেজনা শিথিল হয়ে যায়। এ কেস আজকাল আকছার হচ্ছে? তবে নন্দিতা কী জন্যে এই ভয়ঙ্কর স্নায়ুযুদ্ধে নেমেছিল? হাজারটার উপর আরও একটা হবার জন্যে? শুধু এই? আর কিছু না?

নন্দিতার জীবনের এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা, 'আকছার'-ঘটে-চলা একটা বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন ঘটনা-প্রবাহের বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র? তবে আর ও যুদ্ধে ফল কি? শুধু শেষ ফল ঘোষণাটুকুর আশায়? সেও তো বোঝা যাচ্ছে ক্রমশ। সেই শেষ ফলও হবে এমনি বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন বোদা বিস্বাদ। কেউ বাহাদুরি দিয়ে বলবে না—ওঃ, লড়ল বটে নন্দিতা! কেউ ধিক্কার দিয়ে বলবে না—ওঃ, শয়তান বটে ওই প্রদোষ নামের লোকটা!

নন্দিতা তবে এখন আবার বড়ো উকিলের বাড়ি ছুটবে কেন? নন্দিতা বাসায় ফিরে ঘুমিয়ে পড়বে না কেন? এ সময় শিখা বাড়ি থাকে না, চাকরটা কোথায় কোথায় বেড়াতে যায়, অতএব অবস্থাটা ঘুমের পক্ষে ভারী অনুকূল।

নন্দিতা তাই ডুপ্লিকেট চাবিতে দরজাটা খুলে নিয়ে শিখার সরু খাটটার উপর শুয়ে পড়ল ঝুপ করে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে পড়ে কত সব যেন স্বপ্ন দেখতে লাগল নন্দিতা। কত কথা, কত লোক, নন্দিতা একটা বড়ো গাড়ি চড়ে কোথায় যাচ্ছে, হঠাৎ নন্দিতা সামনে আর রাস্তা দেখতে পাচ্ছে না, দেখছে শুধু অথই জল!

স্বপ্নের মধ্যেও ভাবছে নন্দিতা, কলকাতার রাস্তার মাঝখানে এতবড়ো নদী এল কোথা থেকে? নন্দিতার আর ওই যুদ্ধের কথা মনে পড়ছিল না। আর নন্দিতা এও টের পাচ্ছে না, তার ঘুমের অবসরে যুদ্ধফল ঘোষণা হয়ে গেল। কিন্তু সে কি লোকলোচনের অন্তরালে? সে কি বর্ণহীন? বৈচিত্র্যহীন? না, এতে একটা রং আছে বৈকি। চড়া রং, তাতে 'ও তো হাজারটার একটা' বলে উদাসীন দর্শক চোখ ফিরিয়ে চলে যাবে না। আর খবরের কাগজের খবর সংগ্রহকারীরা 'কাগজে অত জায়গা নেই'—বলে অবজ্ঞা করে ঠেলে রাখবে না। শহরের নিত্যঘটনার একটা হলেও, যে শুনবে বলবে, 'ইস্‌।' বলবে, 'তা হবেই তো এই সব।'

কিন্তু খবরটা প্রথমে নন্দিতার কাছে আসেনি। নন্দিতা তো তখন ঘুমোচ্ছিল।

খবর এল প্রদোষ ভৌমিকের কাছে। প্রদোষ ভৌমিক তখন তার বান্ধবীর সঙ্গে বাহুলগ্ন হয়ে সেই মাত্র একটি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরোচ্ছে। সামনেই প্রান্তিক সোম। প্রদোষ হই চই করে উঠল, 'কী ব্যাপার? তুমি? তুমিও এসেছিলে বুঝি? বাস্তবিক ছবিটা দেখবার মতো, কি বলো?'

প্রগল্‌ভ লোকটা লজ্জা ঢাকতে আরও একটু প্রগল্‌ভ হচ্ছে। কিন্তু তার বন্ধু তাকে অন্যদিনের মতো ধমক দিল না। বলল না, 'বাজে কথা রাখো।' শুধু কালো শুকনো মুখে বলল, 'গাড়িতে উঠে এসো।'

'গাড়িতে? তোমার গাড়িতে? কেন?'

'কথা বলার সময় নেই, এসো।'

বিপাশা পালিত ওর ওই গাম্ভীর্য দেখে একবার হেসে ওঠার চেষ্টা করল, হল না। প্রান্তিক সোমের মুখ দেখে থতোমতো খেলো। প্রদোষও বোধহয় তাই নিঃশব্দে উঠে এল প্রান্তিকের গাড়িতে।

হাত নেড়ে বলল বিপাশাকে, 'তুমি যাও।' কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছে প্রদোষ ভৌমিক।

প্রান্তিকের ওই নিঃশব্দ শাসন আর অনুরক্ত ঘৃণা-আঁকা চোখের তারায় কী ছিল কে জানে! তাই প্রদোষ কথা বলতে পারে না।

কিন্তু প্রান্তিকই বা বলেছে কৈ, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে প্রদোষকে? কী করবে সেখানে গিয়ে প্রদোষ? কী দেখবে? নন্দিতা ভৌমিক বনাম প্রদোষ ভৌমিকের লড়াইয়ের রেজাল্ট?—থই থই জল থেকে টেনে তুলে অজস্র কৌতূহলী দৃষ্টির নীচে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে যাকে?

প্রদোষ ভৌমিক আসতেই ভিড় সরে গেল, আর সবগুলো দৃষ্টি এবার তার উপরেই পড়ল। অনেকগুলো চোখ, অনেক অর্থবহ। বিস্ময় ধিক্কার ঘৃণা সমবেদনা—কতরকম যেন। প্রদোষ কিন্তু কিচ্ছু দেখতে পেল না। কারণ প্রদোষ এই প্রখর সূর্যালোকের মধ্যে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলল।

প্রদোষ তাই খানায় পড়ে-যাওয়া অন্ধের মতো চিৎকার করে উঠল, 'সোম—নন্দিতা?'

প্রান্তিক সোম শান্ত গলায় বলল, 'তাকে আনতে লোক গেছে। এতক্ষণ তোমাকে খুঁজে পেতেই—অফিসে নই, বাড়িতে নেই, শেষকালে পালিতের বাড়ির একটা চাকরের কাছ থেকে—'

প্রান্তিক সোম না প্রদোষ ভৌমিকের চিরদিনের বন্ধু ছিল?

তবে অমন করে প্রদোষ ভৌমিকের ভিতরকার সবচেয়ে নরম জায়গাটায় অমন করে করাত চালাচ্ছে কেন? ছুরি দিয়ে কেটে কেটে নুন লাগাচ্ছ কেন? হ্যাঁ, তাই তো লাগাচ্ছ।

নইলে বলছে কেন, 'তোমার বাড়ির চাকরের মুখে জানতে পারলাম, কাল রাত থেকে খায়নি। আজ বেলা দশটার সময় বেরিয়ে গেছে, না স্নান, না আহার। আশ্চর্য, একটা লাইন লিখে পর্যন্ত রেখে যায়নি।...'

করাত চালাচ্ছে।

অথচ অদ্ভুত শান্ত আর মোলায়েম মুখে। ও কি ভাবছে তাতেই করাতের দাঁতটা গভীর হয়ে বসবে? উত্তেজিত হলে জোরটা কমে যাবে, হাত থেকে খসে পড়বে করাতটা?

তা, শেষ পর্যন্ত খবরের কাগজে নাম বেরোল প্রদোষ ভৌমিকের।

বড়ো বড়ো অক্ষরে অবশ্য নয়, ছোটো ছোটো অক্ষরে।

ঘটনা ও দুর্ঘটনার কলমে ছাপা হল নামটা।

"কল্য বেলা তিনটা নাগাত সময়ে আজাদ হিন্দ বাগে একটি কিশোর বালকের (১৪) মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতের নাম কৌশিক ভৌমিক। বালকের পিতা শ্রীপ্রদোষকুমার ভৌমিক একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত, অসাবধানতা বলিয়াই মনে হয়। বালকটি সেন্ট

জোনস স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। স্কুলের দিন সে স্কুলে না গিয়া শহরের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্তে আসিয়াছিল কেন, এ রহস্য এখনও অজ্ঞাত। তবে স্কুল-কর্তৃপক্ষের সাক্ষ্যে জানা যায় কিছুকাল হইতেই বালকটি ক্লাসে অনুপস্থিত থাকিতেছিল।"

খবরটা কেউ পড়ল, কেউ পড়ল না, কারণ শহরের এই নিত্য খবরগুলোর দিকে সবাই আর নজর দেয় না।...যারা নজর দেয়, তাদের কেউ বলল, পরীক্ষায় ফেল বোধহয়। তা ছাড়া আর কি হবে? বয়েস তো চোদ্দ। কেউ কেউ বলল, আজকালকার ছেলেদের বিশ্বাস নেই, চৌদ্দতেও পাকা-পক্কান্ন হয়। হয়তো হতাশ প্রেম হবে।

একটা ছোটো ছেলে লাইনের নীচে আঙুল দিয়ে পড়ে হেসে উঠে বলল, 'কৌশিক ভৌমিক। দুটো ঔকার। হি হি!'

হ্যাঁ, কৌশিক।

সকলের মুখে মুখে ওই নামটাই ফিরছে। টুবলু নামের যে উজ্জ্বল ছেলেটা শহরের দক্ষিণ প্রান্তের কোনো একটা বড়োসড়ো বাড়িতে যথেচ্ছ খেলে বেড়াত, দুমদাম করত, রেডিও খুলত, রেকর্ড বাজাত, আর স্কুল থেকে ফিরে যেখানে সেখানে জুতো-জামা ছড়িয়ে বলে উঠত, 'মা, শীগগির—ভীষণ খিদে—' সে ছেলেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। 'টুবলু' বলে কেউ নেই। কেউ ছিল না।

কোনো একটা অতলস্পর্শ অন্ধকারের তল হতে যদি সেই অর্থহীন নামটা আর্তনাদ হয়ে আছড়ে আছড়ে এসে পড়তে চায়, কেউ তো শুনতে পাবে না সেই আর্তনাদ, শুধু যুদ্ধোন্মাদ দুটো পক্ষ তাদের জয় আর পরাজয়ের সমস্ত উত্তেজনা হারিয়ে একটা অর্থহীন শূন্যতার মধ্যে হারিয়ে যাবে।

—ঃ ঃ—